আসামের সাংবাদিকের কলমে এনআরসি। ইকো পর্যটন আপার কুমাই। ফের শুরু হাংরি রিপোর্টার

এখন ডুয়ার্স

বিশেষ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৮। ২০ টাকা

তিস্তা জয়ী সেতুবন্ধনে মেখলিগঞ্জ

জলপাইগুড়ি পৌরসভায়
যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চলছে

জলপাইগুড়ি পৌরসভা শহরের নাগরিকদের প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে ১৩৪ বছর অতিক্রম করেছে। এই প্রাচীন পৌরসভার শিকড়টি শহরের গভীর থেকে গভীরের মাটি ছুঁয়ে এখনও সবুজ, এখনও দৃঢ়। শহরের উন্নয়ন, সংস্কার, সৌন্দর্যকরণ-এর সাথে সাথে সভ্যতা, সংস্কৃতি কৃষ্টি ইত্যাদি ক্রমশই নানাভাবে এই শহরটিকে ধনবান করে তুলেছে এবং বাংলায় খ্যাতির শিয়রে পৌঁছে দিচ্ছে।

জলপাইগুড়ি পৌরসভায় বর্তমানে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চলছে তার বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল—

১) এন ইউ এল এম— ১) শহরের গরীব মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভরদল গঠন।
২) স্বনির্ভর দলের ১.২৫ লাখ ক্যাশ ক্রেডিট ঋণপরিষেবা প্রদান।
৩) স্বনির্ভর দলের মহিলাদের ব্যক্তিগত ও দলগত ঋণ-এর ব্যবস্থা করা।
৪) শহরের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানমুখী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫) শহরের আশ্রয়হীনদের জন্য ১.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা।

২) হাউসিং ফর অল (এইচ এফ এ)— ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে ১২৯০টি গৃহ ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা (প্রতিটি গৃহের মূল্য) মূল্যের, পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে ১৯৪৫টি পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি প্রদান করা হবে।

৩) আমরুত— ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তার জলকে পরিশ্রুত পানীয় জলের উপযোগী করে শহরবাসীকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলছে। কান্তেষরী পার্কের সৌন্দর্যায়ন ও নির্মাণ করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। জে ওয়াই এম এ পার্কের সৌন্দর্যায়ন ও নির্মাণ করার কাজ চলছে।

৪) গ্রীন সিটি— ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরের সবুজায়ন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে।

৫) এন ইউ এইচ এম— ইউ পি এইচ সি ১ (লাবন্য মাতৃসদন) এবং ২ (৩নং ঘুমটি) থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও ঔষুধ প্রদান করা হয়।

৬) স্বাস্থ্যসাথী— এই প্রকল্পে ৭৫০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠির পরিবারকে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। আরও ৩০০০ কার্ড প্রদান করা হবে। প্রতিটি পরিবারকে ১,৫০,০০০ টাকা স্বাস্থ্য বিমা প্রদান করা হবে।

৭) সমব্যাথী— ৫২৯ টি পরিবারকে এককালীন ২০০০ টাকা করে পারলৌকিকক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

৮) পথবাতি— শহরের সৌন্দর্যায়ন ও আলোকিত করার জন্য ২৫ টি ওয়ার্ডে এল ই ডি লাইট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৯) রাস্তা ও ড্রেন— ২৫ টি ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তা ম্যাস্টিক ও ড্রেনকে কভার ড্রেনে পরিণত করার কাজ চলছে।

১০) এস ডব্লু এম— প্রতিটি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ চলছে। এর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।

জলপাইগুড়ি শহর— এই পৌরসভা আরও প্রগতিশীল ও সম্পন্ন হয়ে উঠুক। ধন্যবাদান্তে

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৮

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

নয়া পঞ্চায়েত নব গ্রাম
আগামী সংখ্যায়
মাল

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস। মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি। ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের কলমে ৫

আসাম থেকে অতিথি কলমে
এনআরসি, আসামে কোনও বৈষম্য বা বিদ্বেষ নেই! ৮

পাঠকের কলমে
জল্পেশের সংস্কার নিয়ে মানুষের উদ্বেগ উপেক্ষা না করাই মঙ্গল ১০

বিশেষ জন্মাষ্টমী প্রতিবেদন
অসাধু বিনাশে যুগে যুগে আবির্ভাব হওয়ার কথা যাঁর বিপন্ন মানুষ তাঁরই অধীর অপেক্ষায়! ১২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ: মেখলিগঞ্জ
আমার মেখলিগঞ্জ শহর ১৫, চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত পথ 'সাবালক' হবে কবে? ১৭, সীমান্তে আজ উজ্জ্বল গ্রামীণ মেখলিগঞ্জ ১৯, সুটুঙ্গা নদীতে সূর্যাস্ত ও ডাক্তারবাবুর আশ্রম ২৩, রূপকথার সেই কিশোর বেলা হাতড়ে বেড়ায় যে মেখলিগঞ্জ ২৪, বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের নাম মনে রেখেছে কি মেখলিগঞ্জ? ২৫

ডুয়ার্সের হেথা হোথা
হুজুরের হলদিবাড়ি ২৬

পর্যটন
আপার কুমাই অপার চোখে ২৮

শ্রীমতি ডুয়ার্স
দীপশ্রীদের অনুভব ক্লিষ্ট কন্যার চোখে আলো জ্বালে ৩৪, ভারতীয় সংবিধানে নারীর অধিকার ৩৫, মায়ের আঁচলে বেঁধে রেখে চলে এসেছিলাম সেই দিনগুলি ৩৬

বইপত্র
সুরজিৎ বসু'র 'অবতামসী' ৪৫, প্রবীর রায়ের 'কবিতা জীবন' ৪৫

হাংরি রিপোর্টার
মাও সে তুং-এর সঙ্গে চিনে গিয়ে মোলাকাত কাহিনী শুনিয়েছিলেন কানু সান্যাল ৪৬

প্রতিবেশি পিএনপিসি
কোচবিহারের কড়চা— সাবেক ছিটবাসীদের নানা অসন্তোষে ইন্ধন যোগাচ্ছে ভারতবিরোধী চক্র ৪৯, সাফল্য ও জনপ্রিয়তা দুইই অব্যাহত রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫১, হংকং ৫২

খেলাধুলায় ডুয়ার্স
হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ডুয়ার্সের রাগবি 'দধিকাদো' ৫৩

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
মহারাণী কথা ৩৮, লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশ্বর ৪০, ডুয়ার্স থেকে শুরু ৪৩

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬, ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ৩০, রাসায়নিক রস ৫৪

Resort Sonar Bangla
Gorumara National Park
Phone: 03561-266558, +91 8348228111 mail: tirthankar_18@rediffmail.com

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

ইংরাজিতে দুর্বলতা

কেরিয়ার তৈরির পথে মূল অন্তরায়

বেসরকারি চাকরিতে তো বটেই, এমনকি সরকারি সর্ব্বোচ্চ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতেও মার খাচ্ছে মফস্বলের ছেলেমেয়েরা। ইংরাজি বলতে বা লিখতে পারাটাই কেবল নয়, ইংরাজি বুঝতে পারাটাও একই রকম জরুরি।

প্রফেশনাল কম্পিউটার জ্ঞানও অতি প্রয়োজন

আলাদা করে কম্পিউটারে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা না থাকলেও চলে, আজকের কর্মজীবনে সফলতায় মূলত যেগুলি প্রয়োজন—

অ্যাকাউন্টস সফটওয়্যারে দক্ষতা

নিজের কম্পিউটারে হার্ডওয়্যারের প্রাথমিক জ্ঞান

প্রেজেন্টেশন তৈরি। বেসিক প্রোগ্রামিং জানা

কীভাবে দূর করা যায় এসব সমস্যা? কঠিন প্রতিযোগিতায় কীভাবে যোগ্য করে তোলা যায় নিজেকে? পেশাদারি দক্ষতাকে কী করে আরও ধারালো করা যেতে পারে? প্রস্তুতি ও সাফল্যের জন্য কীভাবে এগোতে হয় আজকাল? প্রস্তুতি পর্বে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন?

এসবের সঠিক দিশা পেতে যোগ দিন দু' সপ্তাহের ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্পে।

১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

নামমাত্র খরচে। ন্যূনতম যোগ্যতা হায়ার সেকেন্ডারি পাশ।

প্রশিক্ষণ দেবেন কলকাতার পেশাদার সংস্থা www.trainingkolkata.com

আরও বিস্তারিত জানতে বা আবেদন পত্রের জন্য আসুন।

বিকেল ৪টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন। মার্চেন্ট রোড
জলপাইগুড়ি

বি. দ্র. —এটি NEST সোসাইটি আয়োজিত একটি অ-ব্যবসায়িক উদ্যোগ। সীমিত আসনের অতিরিক্ত আবেদন পত্র নেওয়ার উপায় নেই।

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি

হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড	৯৪৩৪৪৪২৮৬৬
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড	৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির

অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার	৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি

ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে	৯৭৩৩২৪৬৯১৩
বিজয় ঝা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৮৫৩৮৮২২৪০৪

মালবাজার

সম্রাট (হোম ডেলিভারি)	৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা

দিলীপ সরকার, চালসা মোড়	৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি

রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল	৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া

বরুন ঘোষ, পোকিসা	৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট

জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি)	৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি

সৌমেন (হোম ডেলিভারি)	৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি

দেবাশিষ বসুভাট	৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা

অমল চন্দ্র পাল	৯৪৩৪৪১২৬৪৯

তুফানগঞ্জ

আনন্দবাজার বুক স্টল	৯৩৩৩৬৮৮৬৭১

দিনহাটা

হরিপদ রায়	৯৯৩২৬৩৯০৬৮

আলিপুরদুয়ার

দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট	৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার

সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)	৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে	৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাচারি মোড়	৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মালদা

অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি	৯৯৩২৯৬৭৯৯১

বালুরঘাট

মাধববাবু	৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন	৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

সম্পাদকের কলমে

শিক্ষা কি তবে শিক্ষকের খোঁজে গিয়েই পথ হারিয়েছে?

বাংলার বাঘ স্যর আশুতোষের বিখ্যাত সেই জুতো বনাম কোটের কাহিনির মতই শোনায় গপ্পোটা। পরাক্রমশালি এক রাজার দুঁদে মন্ত্রী-সান্ত্রী-মিত্র-অমাত্যরা একবার রাজকোষের অর্থব্যয়ে সম্ভবত কোনও প্রশাসনিক সফরের নিমিত্তে সমবেত বিলাসযাত্রা করছিলেন। তবে সেবার সফর ছিল ট্রেনে, কারণ রাজার কড়া নির্দেশ খরচা বাঁচাতে হবে, সুতরাং বায়ুপথে নয়, যতই দুর্মূল্য হোক তাঁদের সময়, জনগণের অর্থের চাইতে তা কখনও বেশি দামি হতে পারে না! তাঁদের মধ্যে এক মন্ত্রীর পকেটে অধিষ্ঠান করছিল শিক্ষার বিগ্রহ, অন্যজনের হাতব্যাগে ঘুম পাড়িয়ে রাখা ছিল এক প্রখরমতি শিক্ষককে। প্রসঙ্গত, বিশাল সে রাজ্যের প্রত্যন্ত কোনে কোনে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রচারের জন্য রাজ-নির্দেশে এসব 'প্রতীক' সঙ্গে বইতে হত। তা ট্রেনে নৈশ পানাহারের পর একটি কুপে ঘুমোবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন দুই মন্ত্রী। গোল বাধল নিচের বার্থে শোওয়া নিয়ে। সে প্রায় হাতাহাতিই শুরু হয়ে গেল। বাকিদের হস্তক্ষেপে তখনকার মত থামলেও গজরাতে গজরাতে ঘুমোতে গেলেন দুজনই। মধ্যরাত্রে ছোট বাথরুমে যাওয়ার সময় নিচের বার্থের মন্ত্রী চুপিচুপি শিক্ষকসমেত ব্যাগটিকে নিয়ে ছুটন্ত ট্রেনের দরজা খুলে বাইরে নিক্ষেপ করে এলেন। এইবার টের পাবি কেমন মজা! মহা আনন্দে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু ভোরবেলায় বড় বাথরুমের বেগ পেতেই উঠে পড়ে তিনি অবাক হয়ে দেখলেন পকেট থেকে বের করে সাইড টেবিলে রাখা তাঁর বিগ্রহ মূর্তিটিও উধাও! ভীষণ রেগে আপার বার্থের কলার চেপে ধরলেন, বল শালা কোথায় হাপিস করেছিস আমার মাল? উপরের মন্ত্রী ঠান্ডা মাথায় কলার ছাড়িয়ে নিয়ে মুচকি হেসে পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, হেগেটেগে ঘুমিয়ে পড় ওস্তাদ, শিক্ষা গেছে শিক্ষকের খোঁজে!

গরীব শিক্ষকের মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে তার বগলে সুড়সুড়ি দেওয়া হল, অনেক হয়েছে এবার ওসব শিক্ষাটিক্ষা ছাড়ো গুরু, আরও মধুময় হয়ে উঠতে পারে তোমার জীবন যদি বই ছেড়ে ঝাণ্ডা ধর। সেই মহান ভদ্রলোকের সাজানো ছকে গত চল্লিশ বছরের ক্রমবিবর্তনে প্রাদেশিক বঙ্গ মানব যে সরীসৃপে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে আজ কারও কোনও সন্দেহ আছে কি?

পাঠক মার্জনা করুন, এধরণের ফাজিল গপ্পোকে গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় পাতায় স্থান দেওয়ার মত ধৃষ্টতা কোনওকালেই ছিল না। আসলে পণ্ডিতরা ঠিকই বলেন, শিক্ষার অভাব। আর চটুল ছাত্র চটজলদি জবাব দেয়, কেন আমাদের বহুতল বিদ্যা ভবন আছে, প্রকাণ্ড তোরণ আছে, কোমর দোলাবার মুক্ত মঞ্চ আছে, গোলাগুলি করবার বড় মাঠ আছে, মার্কশিট উপচানো নম্বর আছে, মায় ডিগ্রিও আছে। এক শুধু শিক্ষা সেই যে কবে শিক্ষকের খোঁজে বেরোল, আজ অব্দি ফেরে নি! কোথায় গেলেন শিক্ষক? বাম জমানায় কোচবিহারের এক কড়া প্রশাসক শিক্ষকনেতা দূরগাঁয়ের এক প্রাইমারি স্কুলে ইনসপেকশনে যাওয়ার পথে হাটের মধ্যে মহাবিস্ময়ে আবিস্কার করলেন প্রধানশিক্ষক মশায়কে পাটের গাদির ওপর বসে ব্যস্ত বেচাকেনায়! স্কুল তো থাকবে স্যার, কিন্তু নিজের জমিতে ফলানো পাট বেচার মরসুম কি আর বসে থাকবে বলেন? হক কথা বইকি!

শিক্ষক কি তবে বই ছেড়ে মাঠে নেমে কৃষকের লাঙল ধরলেন? কেউ কেউ বললেন, তাকে দেখা যায় ইস্কুল ছেড়ে প্রাইভেট টোলে মিটিংয়ে মিছিলে! মার্কিন মুলুক থেকে একবার সপরিবারে চলে এলেন এক শিক্ষক বঙ্গতনয়, স্বদেশের মাটিতে অধ্যাপনা করবেন বলে! কিন্তু পরীক্ষার দিন তাঁর চোখ ছানাবড়া, অনার্সের ছাত্রদের দাবি পরীক্ষার প্রশ্ন বড্ড কঠিন হয়েছে, হয় তাদের নকল করতে দেওয়া হোক নতুবা সবাইকে ফার্স্ট ক্লাশ দেওয়া হোক! সাগরপারে পলায়নের আগে সেই প্রবাসীরও প্রশ্ন ছিল, শিক্ষা তবে গেল কোথায়? শিক্ষক তো হাজিরই ছিল! মেধা-ফ্যাক্টরি নামে খ্যাত আইআইটি-র অধ্যাপকেরাও নাকি সম্প্রতি ভুরু কোঁচকাচ্ছেন সেই একই প্রশ্ন নিয়ে, ভয়ংকর পড়াশোনা করে কঠোর এন্ট্রান্স টপকে আসা ছাত্রছাত্রীরা নাকি আজকাল ক্লাসের পরীক্ষাতেও ফেল মারছে! শিক্ষা তবে গেলটা কোন চুলোয় বলুন তো?

সেজন্যই কি সেযুগের স্কুলে পাঠরত ও এযুগের স্কুলে চাকুরিরত মানুষটি নিজের পুত্র-কন্যাকে মোটামুটি রেজাল্ট করলেই বাইরের রাজ্যে পাঠিয়ে দিতে সবচেয়ে বেশি তৎপর হয়? কীসের শঙ্কা ফুটে ওঠে তার দু'চোখে? পরিকাঠামো নাকি পরিবেশ? কোনটার অভাব বোধ হয় আজকের বাপ-মায়ের? সেও নিজেও কি নিজের অধীত বিদ্যা নিয়ে সন্দিহান? যে বিদ্যা শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে তাকে কেবল ডিগ্রি দিয়ে গিয়েছে, ভরসা হয় না তার ওপর নিজের সন্তানকে সঁপে দিতে? যে বিদ্যা তার চেতনাকে ক্রমাগত লুপ্ত করেছে, অন্ধকারে রেখেছে কুয়োর ব্যাঙ করে, তার ওপর রাগ করবার ভাষাও কি হারিয়ে ফেলেছে সে? সেই অর্জিত বিদ্যায় ভর করে আজ যে তরুণ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে শিক্ষকের চাকুরি সুনিশ্চিত করতে চাইছে, কাল সে কি কখনও তার ছাত্রছাত্রীদের হাজার হাজার নগদ মুদ্রায় অনার্স কোর্সের আসন ক্রয়ের প্রথাকে রোধ করতে পারবে? নাকি প্রতিবাদে গলা মেলাতে চাইবে কখনও? বিশাল এই জনজঙ্গলে মানুষ তার প্রতিবেশিকে খুন করছে নির্বিকার মধুভাণ্ডের দখল নেবে বলে, পিতৃমাতৃপরিচয় ভুলে যেতেও যেথায় দ্বিধা নেই, সেখানে শিক্ষা কি আর তার শিক্ষকের সন্ধান পাবে আদৌ?

শিক্ষক দিবস এলেই সেই ভদ্রলোকটির কথা খুব মনে পড়ে। যিনি একদিন মতলব আঁটলেন এদেশের বঙ্গবাসীকে ইংরাজি ভাষাটা শিখতে দেওয়া যাবে না! আর শিক্ষকদের শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে সরাতে হবে। নইলে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা উদ্ভট এই জাতটাকে নিয়ে ভবিষ্যতে প্রচুর ভুগতে হবে, কারণে অকারণে বিঘ্নিত হবে মদিরাচ্ছন্ন রাজাভ্যাস! অতএব নবজাতক ভুমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই যাতে ছাগশিশুতে পরিণত হয় সে বন্দোবস্ত হল। গরীব শিক্ষকের মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে তার বগলে সুড়সুড়ি দেওয়া হল, অনেক হয়েছে এবার ওসব শিক্ষাটিক্ষা ছাড়ো গুরু, আরও মধুময় হয়ে উঠতে পারে তোমার জীবন যদি বই ছেড়ে ঝাণ্ডা ধর। সেই মহান ভদ্রলোকের সাজানো ছকে গত চল্লিশ বছরের ক্রমবিবর্তনে প্রাদেশিক বঙ্গ মানব যে সরীসৃপে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে আজ কারও কোনও সন্দেহ আছে কি? সেই ধ্বজা বয়ে নিয়ে চলে লাল জামারা একদিন পথের বাঁকে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর আজ নীল জামার দল চলেছে একইভাবে বুকে ঘষটে ঘষটে। বদলাবার শক্তি যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু কেউ কেউ বলে পায়ে ফোস্কা পড়বার ভয়েই হয়ত নতুন জুতোয় পা গলানোর ইচ্ছে জাগে নি! আবার কেউ বলে এতে নাকি জামা বদলে ফেলা পুরনো লোকেদের হাত রয়েছে। সে যাই হোক, বাংলার শিক্ষাকে চির-বনবাসে পাঠাবার সেই মহান কারিগরকে এখনও কেন শ্রেষ্ঠতম বঙ্গরত্নটি দেওয়া হল না, কেন তাঁর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি আজও ময়দানে সসম্মানে বসানো হল না সে প্রশ্ন কিন্তু আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। বাঙালী হতভাগ্য বিস্মৃত জাত হতে পারে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ তো নয়!

খুচরো ডুয়ার্স

প্রত্ন ইউএসজি

জনৈক দেশদ্রোহী সেদিন কইল যে মেখলি হাসপাতালে একখানা ইউএসজি যন্তর আছে। তা আছে তো আছে! এ আর এমন কি ঢাক পিটিয়ে ফেবুতে পোস্ট করার বিষয়! তা ব্যাটা দেশদ্রোহী একটা কর্কট শলাকা ধরিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে আবার কইল, 'মেশিনটা দশ বছর আগে এসেছে কত্তা!' খুব ভালো কথা! নিশ্চই মেখলিশহরে হবু মায়েরা হবু ছানার নাচন দেখে মহা খুশি হচ্ছে দশ বছর ধরে? শুনে দেশদ্রোহী হাসতে হাসতে প্রায় পাকিস্তান চলে যায়। তখন খুব সন্দেহ হলো। তা'প্পর খবর নিতে গিয়ে শুনি যন্ত্র বছর দশেক আগে এসেছে ঠিকই কিন্তু এখনও প্যাকেট থেকে বের হয় নি। পাছে নষ্ট হয়ে যায় তাই নাকি খোলা হয় নি। তা ছাড়া খুলবে কী করে? রেডিওলজিস্ট নাকি রেডি নেই। মানে তেমন কেউ থাকেই না মেখলিগঞ্জে। তাই দশ বছর ধরে হবু মায়েরা ইউএসজি করার বদলে ইউএসজি দেখে অন্য কোথাও চলে যান। পরে আবার দেশদ্রোহীর সঙ্গে দেখা হতে সে দাড়ি নাড়িয়ে বলল, 'দশ বছর বিফোর মানে লেফট আমল। লাল আমলের মেশিন কখনও নীলসাদা হাসপাতালে ভ্যালিড হয়।?' ঠিক! পাক্কা বিরোধী মার্কা দেশদ্রোহীর কথাই বটে!

হাতবদল

তা হসপিটালের কথাই যখন উঠল তখন জলপাইগুড়ির খবর একটা বলি। এক বিরোধী চক্রান্ত সেরে সুপার অট্টালিকা হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ শুনলেন প্রবল কলহ! কলহের কারণ বাচ্চার হাতে প্লাস্টার। তা হাত ভাঙলে প্লাস্টার হবে না তো কি ম্যাসেজ করা হবে? বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে কোনও চক্রান্ত পেলেন না তিনি। বিমর্ষ চিত্তে ফিরে যাচ্ছিলেন আচমকা কানে এলো 'ডান-বাম-বাম-ডান'! তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে তিনি আবার ছুটলেন কলহস্থলে। যা ভেবেছেন তাই! জোর করে বামদের ডান করান হচ্ছে! বাচ্চার ভেঙেছে বাঁ হাত। সেটা যে ভেঙেছে তা পাব্লিক দেখেই বুঝতে পারছে, কিন্তু অট্টালিকার লোক বুঝছে না! তাঁরা মন দিয়ে এক্স রে প্লেট দেখে প্লাস্টার লাগিয়ে দিয়েছে ডান হাতে! এটা কি অনুপ্রেরণার ফলে বামপন্থীদের ডানপন্থী করা নয়? বিরোধীবাবুর এমন উত্তেজনা দেখা সদ্য কাস্তেত্যাগীরা বলছেন, 'অট্টালিকার বুর্জোয়া এক্স রে চিরকাল সাম্যবাদ স্থাপনে ব্যস্ত। ওখানে মেহনতি মানুষের হাতবদল হবেই'। সে না হয় বুঝলুম কাকা! কিন্তু প্লাস্টারে হাতবদলের অনুপ্রেরণা কোত্থেকে এলো কন দিকি!

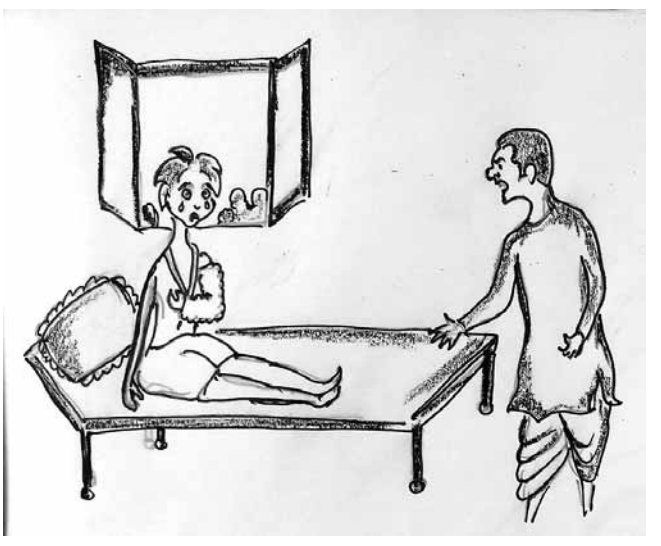

ক্রান্তিকাল

ক্রান্তির হাটে একটা ঘোড়াকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। ঘোড়া ছিল মিঞার আস্তাবলে। কিন্তু মিঞার নিজেরই দানাপানি জোটে না, ঘোড়ার খোরাক যোগার

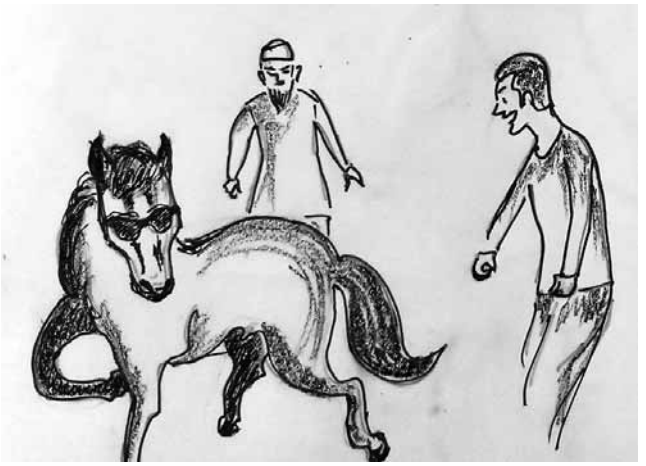

জোটায় কী ভাবে। তাই ঘোড়াকে তিনি ত্যাজ্যাশ্ব করে দিয়েছেন। অনাথ ঘোড়া এখন ক্রান্তির হাটে-মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায় আর ভিক্ষে করে খায়। দিন এভাবেই চলছিল বেশ। হঠাৎ ভিলেনের আগমন। সেদিন একজোড়া ভিলেন কোত্থেকে হাজির হয়ে ঘোড়ার গলায় দড়ি পরিয়ে শুরু করে দিল টানাটানি। তা ঘোড়াকে টানা সোজা কথা মামা! একটা হর্স টানতে কত হর্স পাওয়ার লাগে জানো? এদিকে, যেই দেখেছে ঘোড়া নিচ্ছে কেড়ে, হাটুরেরা হারে-রে-রে-রে! লাগল ধুন্ধুমার লড়াই। ভিলেন পরাজিত। কিন্তু গলার ফাঁস টানাটানিতে টাইট হয়ে ঘোড়া বেচারা তখন খাবি খাচ্ছে। শেষে ফাঁস কেটে জল খাইয়ে ঘোড়াকে আবার অশ্ব করে ঘুরতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঘোড়া আবার ঘুরছে। কাহিনীটাও হাটে হাটে ঘুরছে।

বিপিএলেম

কোচরাজ্যের এক গ্রামে এক বিপিএল-কে ঘর বানাবার টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাই দেখে আরেক এপিএল রেগে বেগুন হয়ে সোজা প্রধানের বাড়ি গিয়ে লাগিয়ে দিল হাঙ্গামা! তা'প্পর কী কী সব কুকথা কানে এলো গো মামা! টাকা পাওয়া বিপিএল-এর নাকি একটা মোটর সাইকেল একটা ট্রাক্টর চারটে আঙুলে সোনার আঙটি গলায় জয় সন্তোষী মা মার্কা সুবর্ণ শৃঙ্খল ইত্যাদি আছে! প্রধানবাবু সব শুনে পস্ট বলে দিলেন, 'আছে তো কী?!!! বিপিএল লিস্টে নাম আসে। মুই বাউন্ড!' তারপর? তারপর আর কী? প্রায় গোষ্ঠিসংগ্রামের উপক্রম। তা গ্রামে সংগ্রাম শেষাবধি বাঁধে নি। মীমাংসা হয়ে গেছে। তাহলে কি কাকা হাইপার বিপিএল-এর কাছ থেকে ঘরের টাকা কেড়ে নেওয়া হলো? পাগল! তা কি হয়? বিপিএল কার্ড সহজে বাতিল হয় না। বিলিওনিয়ার হলেও হয় না কখনও কখনও। তবে মীমাংসা থুড়ি মিউচুয়াল হলো যে? আরে বোকা সেই সংগ্রামী বিপিএল-এর একটা পিকআপ ভ্যান হাটে খাটে এবং কোচরাজ্যের রাজধানীতে তাঁর ফ্ল্যাট আছে। একেই বলে এলেমদার বিপিএল। সংক্ষেপে—।

বিল বিরোধ

না না। ইলবার্ট বিলের বিরোধিতা নয়। দেশ তো এখন স্বাধীন, তবে কোচবিহার কী করে গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্য থেকে জেলা হলো তা যদি গম্মেন্ট ব্যাখ্যা করে বোঝাতে না পারে তবে বিল বিরোধী আন্দোলন চলবেই! মানে, গ্রেটার কোচবিহারের বংশীবাবু সাফ এটাই জানিয়েছেন। তা কোন বিলের বিরোধিতা কত্তা? কী কইলেন? লাইটের বিল? ঠিক শুনছি তো? গম্মেন্ট যদ্দিন ব্যাখ্যা দেবে না তদ্দিন লাইটের বিল জমা দেবে না গ্রেটারের লোকজন? একদম ঠিক শুনছিস গোবরা! এটাই হলো মুভমেন্ট। গ্রেটারের সমষ্টিগত বিলের বকেয়া কোটি ছাড়িয়ে অক্ষৌহিনীর দিকে যাচ্ছে। ব্যাখ্যা নেই, পয়সাও নেই। গম্মেন্টের লোকজন বিল বাকি থাকলে মই কাঁধে লাইন কাটতে ছুটছে ঠিকই, কিন্তু যে গতিতে যাচ্ছে তার পাঁচগুণ স্পিডে ফিরে আসছে তাড়া খেয়ে। কেটে দিলে টুক করে হুক। আন্দোলন কোথায় পৌঁছেছে দেখেছিস গোবরা! বলে কি না খাবো কিন্তু পয়সা দেব না। বিল নাকি সবচে' বেশি বাকি মাথাভাঙ্গায়। ফলে মাথাভাঙ্গার মাথায় হাত। সেখানে বিদ্যুৎ আপিস বকেয়ে বিল কিলবিল করছে রে!

একঘেয়ে

সারাদিন একটা জঙ্গলে বসে বসে কবিতা লিখলে হবে? ঘোরাঘুরি না করলে শরীর ভালো থাকবে কেমন করে? তা ছাড়া নতুন নতুন জঙ্গল ভ্রমণ করলে যেমন অভিজ্ঞতা বাড়বে তেমনি গার্ল-বয়ফ্রেন্ডরাও বিচিত্র হবে। তা জঙ্গলের চারপেয়েরা তো সেটাই চায় কত্তা! আগে কি ঝালং-এর গন্ডার গরুমারায় এসে প্রেম করে যায় নি? কাঠামবাড়ির হাতি কি বিয়ে করে নি বক্সার হাতিনীকে? কিন্তু সে সব হলো 'ওল্ড ইজ গোল্ড'-এর জঙ্গল। এখন দিককাল ভালো নয়। এক ফরেস্ট থেকে আরেক

ফরেস্টে যাওয়া শক্ত ব্যাপার এখন। এই তো সেদিন ন্যাওড়া জঙ্গলের এক চিতা জলদাপাড়ায় ভ্রমণ করবে বলে নেটে খবর নিচ্ছিল। অবস্থা দেখে প্ল্যান বাতিল করেছে। আগে জঙ্গল টু জঙ্গল চারপেয়েরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যেত। এখন চার পা হেঁটেছে কি টুরিস্ট ক্যামেরা বাগিয়ে পপকর্ন খাচ্ছে। করিডোর পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখে হাট বসেছে শুক্রবারে। আগে যেই জায়গায় হরিণ-হরিণীরা স্বয়ংবরে আসত সেখানে একটা প্রাইমারি স্কুল। তাই হরিণ খেতে আসা চিতা ভড়কে যায়। এসব হাতিরাও ফেস করে, তবে ওরা শোধ তোলে মিডডে মিল চুরি করে। সুতরাং একটা জঙ্গলে বসে একঘেয়ে হয়ে বাইসন-গন্ডার-হাতি-বাঘেরা মনের দুঃখে কবিতা লিখবে, এটাই ডেস্টিনি। কী বললেন? বনকর্তারা ভাবছেন চারপেয়েদের ভ্রমণের জন্য করিডোর বানাবেন? করিডোর হতে হতে নিউ জেনারেশানের চারপেয়েরা শহরে থাকা শুরু করে দেবে স্যার! ফালতু চাপ নিয়েন না।

তুফানি বরাহ

কথায় বলে প্রকৃতিতে শূন্যস্থান থাকে না। এই যে বরাহ অবতারের দল এদ্দিন জলপাইগুড়ি পুরসভার পথঘাট আলো করে নাগরিক পরিষেবা নিচ্ছিল, তারা গেল কোথায়? তারা কি পুরসভা বদল করে তুফানগঞ্জে ঘাঁটি গেড়ে বসল? নইলে তুফানি হাসপাতালের চারপাশে তারা দলে দলে এলো কোত্থেকে? এমনিতেই মশাদের আশির্বাদে সেখানে নাম করতে নেই এমন রোগের অভাব নেই। ফলে অবতারদের দাপটে বেজায় চাপে থাকছেন পাব্লিক। এখন অবতারদের তাড়াবে কে? কে করবে এই মহাপাপ? পুরপতি নাকি এসব শুনে ভারি অবাক হয়ে বলেছেন, সব শুওর তো তাড়ান হয়েছে। কিন্তু শুওর তো ভদ্দরলোক নয় যে তাড়ালেই তাড়িত হবে। চারটে শুওরকে তাড়িয়ে দিন। দেখবেন পাঁচটা হয়ে গেছে। শুওর তাড়ান অত্ত সোজা নয়। জলপাইগুড়িতে তো সেনা-টেনা নামানর জো হয়েছিল। এখন দেখা যাক মেখলিগঞ্জে রাফায়েল নামাতে হয় কি না। নইলে অগত্যা সব কটাকে ধরে টিকা দিতে হবে এই যা পরিশ্রম!

টুক্রাণু

শিলিগুড়িতে উড়ালপুল ভঙ্গ। মাদারিহাটে গাছেরা গম্মেন্টকে ফাঁকি দিয়ে কাঠ হচ্ছে। ময়নাগুড়িতে আয়ুর্বেদিক দোকানে ভুয়ো ডাক্তার। দেওয়ান হাটের সব্জি বাজার কাদা বাজারে পরিণত। ডুয়ার্সে হামলা মোমো গেমের। নাগরাকাটায় হাতিদের রাগ কমছেই না। হঠাৎ কালো হলো ঘিস নদীর জল। বৃষ্টি হলেই ভিজে ভিজে সর্দি লাগে মালবাজার ডিপোর সরকারি বাসেদের। দুধ বেচে দাম চাইতেই বিক্রেতার কানে কামড়ে দিল ক্রেতা, ধূপগুড়িতে। হাতিদের রাখি পরানো হয়েছে ডুয়ার্সে, হাতিরা কিছু খাওয়ায় নি। বেরুবাড়ির তেজপাতা আরো তেজাল, আরব মুলুকে যাচ্ছে। এবার চালক রেলগাড়ি থামিয়ে হাতি বাঁচালেন গুলমার কাছে। কারা জানি ডুয়ার্স থেকে ভুয়ো দার্জিলিং চা পাঠাচ্ছে কাজাখস্তানে।

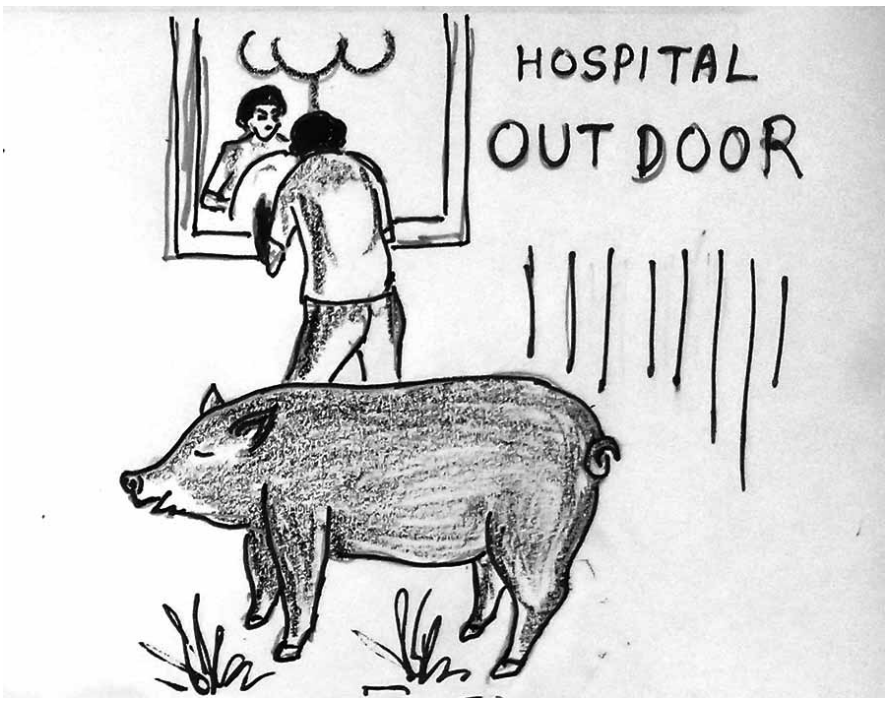

ছড়রা

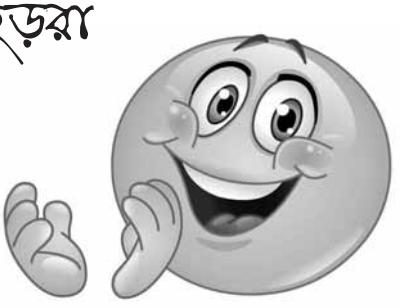

বাংলা

বাংলা মানে আমার কাব্যি তোমার গান
বাংলা মানে ছিপি খুলে বোতল পান
বাংলা মানে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা
বাংলা মানে হ্যাংলামি আর হিংসে ঠাসা
বাংলা মানে হরির লুট লেন ও দেন
বাংলা মানে পকেট ভরান গৌরি সেন
বাংলা মানে সোঁদর বনের ভোঁদর নাচ
বাংলা মানে আঙুল ফুলে কলাগাছ
বাংলা মানে সব তালিকার শেষ নাম
বাংলা মানে কামচোরেদের অনেক দাম
বাংলা মানে নিজভূমেতে পরবাস
বাংলা মানে নিজের পেছন নিজের বাঁশ
বাংলা মানে ইতিহাসের জাত বেহায়া
বাংলা মানে আর কেঁদো না কুমীর ভায়া।

ছন্দোপন বন্দ্যোপাধ্যায়
(নতুন নামকরণে আপ্লুত বঙ্গজ)

(ব্যঙ্গ ছড়া পাঠান। বিষয় সাম্প্রতিক ডুয়ার্স। ইমেল: editor.ekhonduars@gmail.com)

আসাম থেকে অতিথি কলমে

এনআরসি
আসামে কোনও বৈষম্য বা বিদ্বেষ নেই!

আসামের সাম্প্রতিক নাগরিক পঞ্জীকরণ নিয়ে সবচেয়ে আসামের সাম্প্রতিক নাগরিক পঞ্জীকরণ নিয়ে সবচেয়ে বেশি উত্তাল হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বহু বুদ্ধিজীবি। অনেকের মতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধানে হওয়া এই নাগরিক পঞ্জীকরণ নাকি বাঙ্গালী স্বার্থবিরোধী বা প্রকারান্তরে বাঙ্গালী খেদাও অভিযান। কিন্তু আসামের সাধারণ মানুষ তাঁদের এই দাবি মানতে একেবারেই নারাজ। বরং তাঁদের বক্তব্য, আপনারা আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবেন না, দয়া করে ওটা আমাদের ওপরেই ছেড়ে দিন। সত্যি কথা বলতে এনআরসি-র প্রথম খসড়া তালিকা বেরোবার পর থেকেই দেশের সর্বত্র আলোড়ন পড়ে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু আসামে ভাষা সম্প্রদায় ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, অন্ততপক্ষে তিরিশ লাখ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী (তারা সবই বাংলাদেশের নাগরিক) উত্তরপূর্ব ভারতের এই রাজ্যে বাসা বেঁধে আছে।

প্রসঙ্গত, জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণের খসড়া তালিকায় ৩,২৯,৯১,৩৮৪ ব্যক্তি নাগরিকপত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন, তার মধ্যে ২,৮৯,৮৩,৬৭৭-র

আজ কারও অজানা নয়, লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আসাম সহ অরুণাচল নাগাল্যান্ড মেঘালয় মণিপুরের মত উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৫ আসাম চুক্তির পরে তৈরি হল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল অসম গণ পরিষদ, যাতে ঠাঁই পেলেন সব ছাত্র নেতারা। আসামে তারপর এযাবৎ দু'বার ক্ষমতায় এসেছিল তাঁদের এই দল। কিন্তু লজ্জার বিষয় হল আঞ্চলিক নেতারা অনুপ্রবেশের ইস্যুটিকে সমাধান করবার জন্য কিছুই করেন নি বলা যায়।

নাম বৈধ নাগরিক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তবে বাকিরা অগস্টের ৩০ থেকে সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখ পর্যন্ত বৈধ কাগজপত্র সহ ফের আবেদন করতে পারবেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী এই খসড়া তালিকা প্রকাশকে ঐতিহাসিক উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের ভুয়সী প্রশংসা করে, এনআরসি-র কাজে নিযুক্ত ৫৫০০০ সরকারি কর্মচারীকে এবং সেই সঙ্গে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমতল ও পার্বত্য এলাকার সমস্ত মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেছেন, বৃহত্তর অহমিয়া সমাজের স্বার্থ সুরক্ষার এক হাতিয়ার এই পঞ্জীকরণ এবং এতে প্রকৃত ভারতীয়দের আশা আকাঙ্খা বোধকে জাগিয়ে তুলবার সদর্থক পরিবেশ তৈরি হবে বলেই তিনি মনে করেন। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকায় এই পঞ্জীকরণ ত্রুটিমুক্তি করা সম্ভব হবে বলে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস, খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবার পরে গোটা রাজ্যজুড়ে জাতপাত ধর্ম বর্গ ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ যে সংহতির পরিচয় দিয়েছেন চূড়ান্ত তালিকার পরেও সেই ঐক্য বজায় থাকবে।

কিন্তু তাই বলে সবাই যে এনআরসি-র খসড়া তালিকা নিয়ে খুশি বলা যায় না। সংসদের উভয় কক্ষেই বিরোধীরা সরব হয়েছেন, বিতর্কে সামিল হয়েছেন, শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন দল এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস বিএসপি আরজেডি সিপিএম এআইইউডিএফ প্রমুখ বিরোধীরা তাঁদের প্রবল অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন, কড়া সমালোচনা করেছেন খসড়া তালিকার। বিজেপি সরকারের বিভেদ রাজনীতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাতেও সর্বদলীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। দলের কয়েকজন

নেতাকে আসামে পাঠিয়ে মমতা বোঝাতে চেয়েছেন মানুষের স্বার্থে এই এনআরসি হয় নি তাই এই বিরোধিতা। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন খসড়া তালিকা প্রকাশ হলে আসাম জুড়ে হিংসা দাঙ্গা হবে, পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের দিকে গড়াবে। কিন্তু বাস্তবে তা যখন হল না তখন তিনি বললেন সেটা ছিল তাঁর অনুমান মাত্র।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন সাতচল্লিশে স্বাধীনতার পরে ১৯৫১ সালে দেশে প্রথম জনগণনার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পঞ্জীকরণও হয়েছিল। বাংলাদেশ সংলগ্ন রাজ্য আসামে নতুন করে পঞ্জীকরণ হল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ও তত্বাবধানে। এর আগে আসামে এনআরসি-র প্রথম খসড়া তালিকা প্রকাশ হয়েছিল ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর। এই এনআরসি তৈরি হয় ১৯৮৫ সালে কেন্দ্র ও আসামের আন্দোলনকারী নেতাদের মধ্যে যে চুক্তি হয় সেই অনুযায়ীই। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উপস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক আসাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও গণ সংগ্রাম পরিষদের নেতারা। ১৯৭৯ সালে আসামে যে তীব্র গণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার সমাধান পথ বেরোয় ছ-বছর পরে এই চুক্তির মাধ্যমেই। এই চুক্তিতে ১৯৭১-র ২৪ মার্চ মধ্যরাতের পর যে সব অনুপ্রবেশকারী (পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশি নাগরিক) আসামে ঢুকেছে তাদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠাবার দায়িত্ব দিল্লির ওপর বর্তায়। অর্থাৎ ঐ তারিখের আগে এসে বসবাসকারী বাকি সবাইকে আসামের প্রকৃত নাগরিক বলে প্রকারান্তরে মেনে নেন আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ। অথচ বলা নিস্প্রয়োজন যে সারা দেশের মত ১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী নির্ধারণ করতে হবে বলেই এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অবশ্য এই চুক্তিতে আসামের মানুষকে সাংবিধানিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সফল হয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা।

আজ কারও অজানা নয়, লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আসাম সহ অরুণাচল নাগাল্যান্ড মেঘালয় মণিপুরের মত উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মোট ভৌগোলিক সীমানার ৯৯ শতাংশই (৫১৮২ কিমি) তিব্বত, নেপাল, ভুটান, মায়নামার এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা, যার মধ্যে বাংলাদেশের একারই রয়েছে ১৫৯৬ কিমি। ১৯৮৫ আসাম চুক্তির পরে তৈরি হল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল অসম গণ পরিষদ, যাতে ঠাই পেলেন সব ছাত্র নেতারা। আসামে তারপর এযাবৎ দু'বার ক্ষমতায় এসেছিল তাঁদের এই দল। কিন্তু লজ্জার বিষয় হল আঞ্চলিক নেতারা অনুপ্রবেশের ইস্যুটিকে সমাধান করবার জন্য কিছুই করেন নি বলা যায়। এরপর অগপ-কে দোসর করে বিজেপি সরকার সোনওয়ালের নেতৃত্বে মে ২০১৬ তে ক্ষমতায় আসবার পরেই আসামকে 'অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি ও দূষণ মুক্ত' করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে।

প্রাথমিকভাবে এনআরসি খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবার কথা ছিল ৩০ জুন, কিন্তু আসাম সরকারের অনুরোধে তা এক মাস পিছিয়ে দেন সুপ্রিম কোর্ট। এর কারণ হিসেবে এনআরসি রাজ্য কোঅরডিনেটর প্রতীক হাজেলা আদালতকে জানান, বন্যায় বরাক উপত্যকার কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দির মত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পঞ্জীকরণের কাজ ভীষণ ব্যাহত হয়েছে।

এই পঞ্জীকরণের পদ্ধতি প্রক্রিয়া নিয়ে যথেস্ট উদ্ভট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এনআরসি নিয়ে সোচ্চার হয় 'আওয়াজ' নামে একটি প্রচারক সম্প্রদায়।

পরিস্থিতির বিচার করে আসামের দেশপ্রেমী কিছু মানুষের একটি সংগঠন 'পেট্রিয়টিক পিপলস ফ্রন্ট আসাম' সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের উদ্দেশে আর্জি জানিয়েছেন এসময় ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখার জন্য, কারণ তাঁদের মতে বেশ কিছু সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক নেতা, সমাজ কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং আন্তর্জাতিক 'নারদ' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত এই পঞ্জীকরণকে বাঙ্গালী বিরোধী বা মুসলিম বিরোধী অভিযান বলে চালাতে চাইছেন, সুকৌশলে অবাঞ্ছিত বিতর্কের সৃষ্টি করছেন। শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জি যে ভাবে এনআরসি-র বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখেছেন তার সমালোচনা করেছেন।

তাদের উদ্যোগে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শত হাজার মানুষ এক অনলাইন আবেদনে স্বাক্ষর করে। যার শিরোনাম ছিল — ইন্ডিয়া স্টপ ডিলিটিং মুসলিমস (ভারত! মুসলমান উৎখাত বন্ধ কর)। এই আবেদনে লেখা হয়, ভারত আসামের নাগরিক তালিকা থেকে ৭০ লক্ষ মুসলিমের নাম বাদ দেবে, তার কারণ তারা অন্য ভাষায় কথা বলে ও অন্য দেবতার পুজো করে। এতে আসামে আসন্ন গণহত্যার জিগির তোলা হয়, বলা হয় মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতির মতই হবে এখানেও, স্বামী-স্ত্রী-পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা আলাদা প্রিজন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সেখানেই তারা পচে মরবে। রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল সেক্রেটারির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই আবেদনে বলা হয়, পঞ্জীকরণ তালিকা প্রকাশের আগে সতর্ক বার্তা জারি হোক, তা না হলে গণহিংসা, জাতিদাঙ্গা, সংখ্যালঘুদের নিকেশ করা বা ক্যাম্পে পাঠানো ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুরু হয়ে যেতে পারে।

এর আগে পঞ্জীকরণ চলাকালীন বাঙ্গালী মুসলমান পরিবার বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এই মর্মে রাষ্ট্রসংঘের চারজন বিশেষ তদন্তকারী তাঁদের উদ্বেগের কথা নয়াদিল্লিকে জানায়। তাঁদের আরও উদ্বেগের কারণ, চূড়ান্ত তালিকার বাইরে যাদের নাম থাকবে তাদের নিয়ে ভারত সরকারের কোনও নির্দিষ্ট নীতি ঠিক হয় নি। এরপর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে আশংকা প্রকাশ করে যে এনআরসি-তে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ দেশহীন হতে পারে। তারা বলেন, এছাড়া এমনও হতে পারে বহু মানুষ যারা দশকের পর দশক ধরে এ দেশে আছেন তারাও ভুলবশত নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

এই সব অভিযোগকেই খারিজ করে দিয়েছেন এনআরসি কর্তৃপক্ষ, তাঁদের কথা পঞ্জীকরণের কাজ পুরোটাই সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে হচ্ছে, বেনিয়ম হওয়ার প্রশ্নই নেই। বরং তাঁদের মতে এই সব অভিযোগের সারমর্ম দেখেই বোঝা যায় এরা মানুষকে বিপথে চালিত করে গুজব ছড়িয়ে তাদের খেপিয়ে তুলে নিজেদের অসাধু কার্যসিদ্ধি করতে চায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও বক্তব্য তাই, কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃত ভাবে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছেন। তিনি অভয় দিয়ে বলেছেন, নিশ্চিন্তে থাকুন পঞ্জীকরণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হচ্ছে এবং খসড়া তালিকায় নাম না থাকলে তার বিরুদ্ধে কোনও অপ্রীতিকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, 'একটা জিনিস খোলসা করে বলতে চাই, সেটা হল চূড়ান্ত তালিকাতেও যদি নাম না থাকে তাও ঘাবড়াবেন না, তাঁদেরকে ট্রাইবুনালে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে'।

পরিস্থিতির বিচার করে আসামের দেশপ্রেমী কিছু মানুষের একটি সংগঠন 'পেট্রিয়টিক পিপলস ফ্রন্ট আসাম' সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের উদ্দেশে আর্জি জানিয়েছেন এসময় ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখার জন্য, কারণ তাঁদের মতে বেশ কিছু সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক নেতা, সমাজ কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং আন্তর্জাতিক 'নারদ' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত এই পঞ্জীকরণকে বাঙ্গালী বিরোধী বা মুসলিম বিরোধী অভিযান বলে চালাতে চাইছেন, সুকৌশলে অবাঞ্ছিত বিতর্কের সৃষ্টি করছেন। শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জি যে ভাবে এনআরসি-র বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখেছেন তার সমালোচনা করে তাঁরা জানিয়েছেন ১৯৫১ সালের ভিত্তিতে সারা দেশের জন্য প্রযোজ্য একই রকম পঞ্জীকরণ নিয়ম চালু করার দাবিতে তাঁরা অগ্রসর হবেন। তাঁদের মন্তব্য, আসামের পঞ্জীকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই তার থেকে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা নিক অন্যান্য রাজ্যও, যাতে ভবিষ্যতে সেসব রাজ্যেও এনআরসি চালু করা যায়। এই ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আবার বলা হয়, যারা শেষ পর্যন্ত নাগরিকত্ব পাবেন না তাদের জন্য ওয়ার্ক পারমিট (ভোটদানের ক্ষমতা থাকবে না) চালু করা যায় কিনা সেই পুরনো প্রস্তাব নিয়ে ফের আলোচনা হোক - একটি সহনশীল দেশ হিসেবে ভারতের পক্ষে তাদেরকে শারীরিকভাবে বিতাড়নের মত অমানবিক সংকটে পড়া কখনই সম্ভব নয়।

নব ঠাকুরিয়া

প্রতিবেদক উত্তরপূর্ব ভারতের একজন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার। navathakuria@gmail.com। এই প্রতিবেদন তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব অভিমত।

পাঠকের কলমে

জল্পেশের সংস্কার নিয়ে মানুষের উদ্বেগ উপেক্ষা না করাই মঙ্গল

খবরে প্রকাশ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের গড়তলি গ্রামের বিখ্যাত ও প্রাচীন জল্পেশ মন্দিরের সংস্কারে এগিয়ে এসেছে সুদূর মুম্বাইয়ের একটি ট্রাস্ট বোর্ড। তারা উন্নয়নের নানাবিধ পরিকল্পনাকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে জল্পেশ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সঙ্গেও একপ্রস্থ আলোচনা করে নিয়েছে। ভেতরে ও বাইরে মাপজোখ করে ইতিমধ্যে উন্নয়নের একটা খসড়া তালিকাও তুলে দিয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে বর্তমান শিবলিঙ্গটি সোনায় মুড়ে দেওয়া হবে, লিঙ্কের চারপাশ বাঁধাই করা হবে রুপো দিয়ে। বিদেশ থেকে পাথর আনিয়ে মন্দিরের চারপাশে বসানোর ভাবনা রয়েছে। পাইপের সাহায্যে শিবলিঙ্গে জল ঢালার ব্যবস্থা হবে। পূণ্যার্থীরা নলের মধ্যে জল ঢাললে তা শিবলিঙ্গের পাশে গিয়ে জমা হবে। মন্দিরের মূল চত্বরে প্রবেশ করার পর যেখানে ফুলের বাগানটি রয়েছে সেখানে ৩০ ফুট উঁচু একটি পাথরের শিবমূর্তি বসানো হবে। ওই মূর্তির মাথায় কৃত্রিমভাবে জল ঢালার ব্যবস্থা থাকবে। মন্দির চত্বরে নানা আলোর ব্যবস্থা হবে। মন্দিরের উত্তর দিকে দুর্গা মন্দির, হনুমান মন্দির ও শনি মন্দির তৈরি করা হবে। জল্পেশ মন্দির থেকে ২০০ মিটার দূরত্বে ট্রাস্টি বোর্ডের জায়গায় থাকা ভ্রামরী মন্দিরটিও ভেঙে নতুন ভ্রামরী মন্দির ও গণেশ মন্দির তৈরি করা হবে। মন্দির চত্বরের সম্পূর্ণ অংশ মার্বেল পাথরে মুড়ে দিয়ে পূণ্যার্থীদের প্রবেশের জন্য মন্দিরের ভিতর থেকে শুরু করে বাইরের বেশকিছু অংশজুড়ে লোহার উড়ালপুল তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মুম্বাইয়ের ট্রাস্টি বোর্ড। বলা যেতে পারে এই পরিকল্পনায় জল্পেশ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডও সম্মতি দিয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে তারা ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় আলোচনা করে মুম্বাই ট্রাস্টি বোর্ডকে কাজেরও অনুমতি দিয়েছে। মুম্বাইয়ের ট্রাস্টি বোর্ডও প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করেছে। পুজোর আগেই তারা এই কাজের অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছে। প্রাথমিকভাবে তারা ৪০ কোটি টাকার বাজেট মাথায় রেখেছে।

মুম্বাই ট্রাস্টি বোর্ড ইতিমধ্যে কিছু স্থপতি ও কারিগরি বিশারদকে এনে মন্দির পর্যবেক্ষণ করে গেছেন। প্রাথমিকভাবে মাপজোখ ও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে তাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। মুম্বাইতে বসে তারা দ্রুত মডেল নকশা নিয়ে আবার আসবেন এবং তারা জানিয়েছেন যে দক্ষিণ ভারতের সোমনাথও ভীমশংকর মন্দির সংস্কারে নিযুক্ত কর্মী ও বিশারদদের সহযোগিতা নেওয়া হবে। যারা এসেছেন তারাও অভিজ্ঞ এবং কুশলী প্রযুক্তিবিদ। জল্পেশ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব জানিয়েছেন যে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাজ করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। তাদের আশা এই কাজ সম্পন্ন হলে মন্দিরের যথার্থই উন্নয়ন হবে।

এ ধরনের খবর প্রকাশ হতেই স্বাভাবিকভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি আলোড়িত হয়। অনেকে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। বাণিজ্যিকীকরণের প্রয়াসের কথাও উঠে আসে। পর্যটনের অঙ্গ হিসাবে জল্পেশ মন্দিরকে তুলে ধরার অঙ্গ হিসাবে এই ধরণের উন্নয়নকে মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। বস্তুত বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। কারণ এই মন্দিরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের শুধু নয় বলা যায় প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গসহ আসাম, ভুটান ও নেপালের একটা অংশের ভাবাবেগ জড়িত। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দিক থেকেও জল্পেশ মন্দিরের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেই সঙ্গে কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাসের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আজও যা গুরুত্বপূর্ণ স্থান বটে। ভুটানের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেও এই জল্পেশ মন্দিরের একটা গুরুত্ব আছে বইকি। আবার ধর্মীয় সংস্কৃতির বিবর্তনের নিরিখেও জল্পেশ মন্দিরের প্রসঙ্গ বারে বারে আসে। সেটা শুধু বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয় ভুটিয়া, নেপালিদের ধর্মীয় বিশ্বাসেরও খোঁজ দেয়। ইতিহাস বিজড়িত তো বটেই। ডুয়ার্স তথা সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সামগ্রিক ইতিহাস, অর্থনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই মন্দিরের ভূমিকা ইতিহাস কথিত। যা সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে। সর্বোপরি এই জল্পেশ মন্দির নিয়ে আসাম, বাংলা, ভুটান, নেপালের বহু মানুষের ধর্মীয় আবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটন স্থান তো বটেই। স্বভাবতই এই মন্দির নিয়ে যে কোনও ধরনের খবরে এতদঞ্চলের আপামর মানুষজন আলোড়িত হবেন এটাই স্বাভাবিক। সেখানে বিভ্রান্তির যেমন সুযোগ নেই তেমনই এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে সবসময়ের জন্যই।

জল্পেশ মন্দির উত্তরবঙ্গের অন্যতম মন্দির। সুদূর অতীতকাল ধরেই ধারাবাহিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারকও বটে। উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় অংশ তো শৈব দেশ হিসাবে আখ্যায়িত। কোচ রাজবংশও ছিল শৈব অনুরাগী। শৈবধর্ম গ্রহণ করেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য মহারাজকে শৈব ধর্মে দীক্ষিত করে শৈবপুত্র হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এই প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের বহু রূপে শিবের অবস্থান। বাণেশ্বর, জটেশ্বর, শিবেশ্বর, জটিলেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, বটেশ্বর সর্বোপরি এই জল্পেশ্বর। পুজো পদ্ধতি প্রকরণেও বহু বিভিন্নতা। যেমন বাণেশ্বরের পাঁঠা বলি দেওয়া হয় আছড়ে মেরে। সামান্য উপাচারে গাঁজা, ভাঙ, দুধ, কলা দিয়ে নিজেরাই পুজো প্রদান করে বিভিন্ন জনজাতির মানুষেরাও। অতীতে অধিকারী পুরোহিতরাই রাজবংশী সমাজে শিবের পুজো করতেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সংযোজন ঘটেছে শ' দেড়েক বছর আগে। মন্দিরগুলিতে পুজো করার জন্য কোচ রাজারা কাশী, কণৌজ, মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণ এনে ভূমিদান করে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। জল্পেশ মন্দির রাজবংশী ধর্মীয় জীবনে জল্পেশ্বরের ভূমিকা এখনও প্রখর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে রাজবংশী

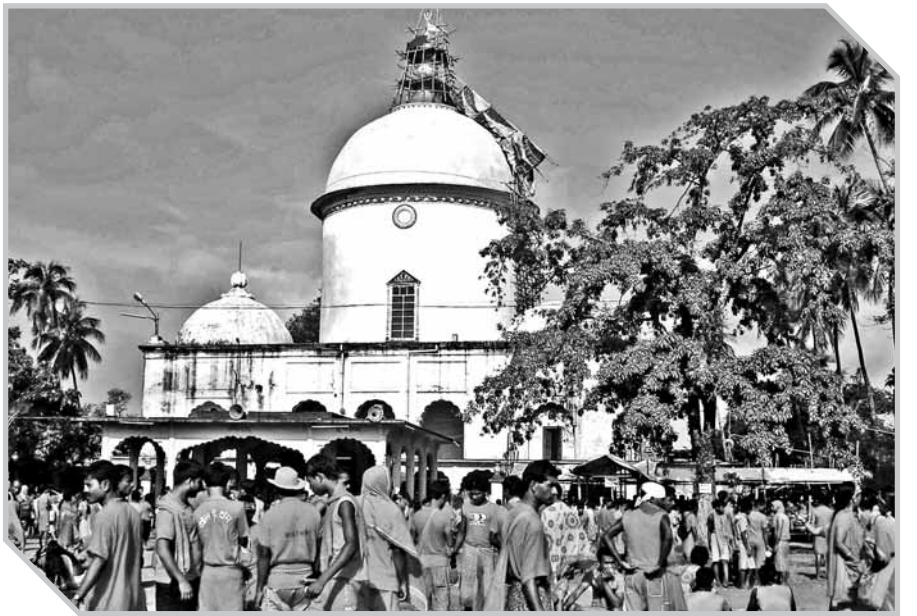

সমাজ আত্মস্থ করলেও শৈবভাবনায় কোনও বিচ্যুতি হয়নি বরং অদ্ভুত সমন্বয় সাধন ঘটেছে। সেটা কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে গেলেও যেমন বোঝা যায় তেমনই অন্যান্য ধর্মীয় স্থানেও দৃশ্যমান। জল্পেশ্বরের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। জল্পেশকে ঘিরে আজও বহু কথন, মিথ, জনশ্রুতি প্রচলিত। আবার পুরাণ শাস্ত্রেও জল্পেশের কথন, মিথ, বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কথিত মহারাজা প্রাণনারায়ণ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। অনেকে আবার শাস্ত্র পুরাণ ঘেঁটে জল্পরাজারও উল্লেখ করেন। কিন্তু বাস্তবিক কোচ রাজবংশের সঙ্গেও এই জল্পেশ মন্দিরের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। স্বাভাবিকভাবে বৃহত্তর রাজবংশী সম্প্রদায় এই মন্দির জল্পেশ্বরের সঙ্গে আত্মিকভাবেই সম্পৃক্ত। আজকে এই জল্পেশ বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের কাছে অন্যতম দেবতাও বটে। ভুটানিদের কাছেও জল্পেশ জাগ্রত দেবতা— মহাকাল। নেপালিরাও জল্পেশ শিবের প্রতি অনুরক্ত।

এই জল্পেশ মন্দির ও মেলার গুরুত্ব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। এইটুকু বলা যায় আজকের সময়েও জল্পেশ মন্দিরের গুরুত্ব সমাজ জীবনে অপরিসীম। ইদানীং শ্রাবণী তিথি ও মেলাকে ঘিরে জল্পেশের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই মন্দিরকে ঘিরে যে কোনও খবর এতদঞ্চলের মানুষজনকে আলোড়িত করে — সেটা কোনও ধরনের পরিবর্তনই হোক কিংবা উন্নয়নের নামান্তরে বাণিজ্যিকরণের প্রয়াসই হোক না কেন। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, সোনা দিয়ে মুড়ে কিংবা রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে গঠনগত কোনও পরিবর্তন অথবা তদ্‌পরবর্তী নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রবেশ ও পুজো প্রদানে সমস্যা উদ্ভূত হলে সাধারণ পূণ্যার্থীরা সহজে মেনে নেবেন না। কারণ কৌমভাবনার

সোনা দিয়ে মুড়ে কিংবা রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে গঠনগত কোনও পরিবর্তন অথবা তদ্‌পরবর্তী নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রবেশ ও পুজো প্রদানে সমস্যা উদ্ভূত হলে সাধারণ পূণ্যার্থীরা সহজে মেনে নেবেন না। কারণ কৌমভাবনার পৃষ্ঠপোষক, ঐতিহ্য পরম্পরার অনুসারী বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এই জল্পেশ্বর নিয়ে শুধু আবেগপ্রবণ নয় খানিকটা সংরক্ষণপন্থীও বটে।

পৃষ্ঠপোষক, ঐতিহ্য পরম্পরার অনুসারী বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এই জল্পেশ্বর নিয়ে শুধু আবেগপ্রবণ নয় খানিকটা সংরক্ষণপন্থীও বটে। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে অতিমাত্রায় নতুবা ভিন্ন এক সমস্যার জন্ম হতে পারে সময় পরিস্থিতির নিরিখে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ বিষয়ে জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায় মুম্বাইয়ের 'সারদা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' জল্পেশ মন্দিরের প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্কারে এগিয়ে আসে। সারদা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট একটি বেসরকারি সংস্থা হলেও দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি মন্দির (সোমনাথ মন্দির, ভীমশংকর মন্দির) তারা সংস্কার করেছে। তিনি জানালেন, 'বর্তমান জল্পেশ মন্দিরের শিবলিঙ্গটি খণ্ডিত হয়েছে। সেটাই সোনা দিয়ে বাঁধাই করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির ভ্রামরী দেবীর মন্দির ও দেবী দুর্গা মহাদেবীর মন্দিরটিও তারা সংস্কার করবেন। পাশাপাশি সৌন্দার্যায়নে বাগান চত্বরে৩০ ফুটের একটি মূর্তি স্থাপন করবেন। সেই সঙ্গে গণেশ মন্দির, কুবিরেশ্বর মন্দির, মহাকাল মন্দির, বটেশ্বর মন্দিরগুলিও সংস্কার করবেন। ভ্রামরী দেবীর মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করবেন। মূল মন্দিরের কোনও পরিবর্তন তারা করতে পারবেন না। শুধু গর্ভগৃহ ও শিবলিঙ্গটি সোনা রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে সংস্কারের ব্যবস্থা করবেন। আর বাইরে ভগ্নপ্রায় কয়েকটি মন্দির তারা পুনর্নির্মাণ করে দেবেন। ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরের কোনও পরিবর্তন ঘটাবেন না। বাণিজ্যিকীকরণের কোনও ভাবনা নেই। এতদসত্ত্বেও উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে অনেকের মনে। মানুষ জল্পেশকে আত্মার আত্মীয় মনে করেন, নিজেদের ধর্মীয় প্রার্থনা, মনস্কামনার আশ্রয়স্থল হিসাবেই মনে করেন, কোনওদিন কোনও কারণে বাধার সম্মুখীন হননি, সহজ সরল মনে ছুটে যান, যখন মনে হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই জল্পেশ উত্তরের উদ্বেগের নরম জায়গাও বটে। উন্নয়ন সংস্কার, প্রয়োজন তবে সেটা সতর্কভাবেই করতে হবে।

তথ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই শুভ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরিপদ রায় (জলপাইগুড়ি), পরিতোষ দত্ত (কলকাতা), দীনেন্দ্র রায় (ময়নাগুড়ি), গিরিন্দ্রনাথ দেব, সম্পাদক, জল্পেশ ট্রাস্টি বোর্ড।

জ্যোতির্ময় রায়

(মতামতের দায় প্রতিবেদকের নিজস্ব, 'এখন ডুয়ার্স' সম্পাদক বা প্রকাশকের নয়)

জলপাইগুড়ি শহরের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে
'এখন ডুয়ার্স' আয়োজিত

ডুয়ার্স বাংলা সীমান্ত মঞ্চ নাটক প্রতিযোগিতা

১৭ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর ২০১৮, জলপাইগুড়ি

নাট্যদলগুলিকে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাই

নিয়মাবলী

১। নাটক করতে হবে ৩৫ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে। মঞ্চসজ্জার জন্য অতিরিক্ত ১০ মিনিট।

২। নাটক হতে হবে মৌলিক। রাজনৈতিক প্রচারমূলক নাটক অথবা কোনও বিদ্বেষমূলক নাটক চলবে না।

৩। ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে (২০১৮) নাট্যদলের নাম, ঠিকানা, নাট্যকারের নাম, পরিচালকের নাম, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং ফোন নাম্বার সহ নিচের ঠিকানায় জমা দিতে হবে। সঙ্গে থাকতে হবে নাটকের সংক্ষিপ্তসার সহ নাটকের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। আবেদন করবেন — সম্পাদক, এখন ডুয়ার্স। জমা দেওয়ার ঠিকানাঃ আড্ডাঘর। মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১। অথবা মেইল করুন editor.ekhonduars@yahoo.com

৪। আবেদনকারী দলের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে নির্বাচন করা হতে পারে।

৫। প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত দলগুলিকে নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যাতায়াত ভাতা এবং টিফিন দেওয়া হবে। মঞ্চে সাধারণ আলো এবং শব্দপ্রক্ষেপণ ব্যবস্থা থাকবে। মঞ্চসজ্জার কোনও উপকরণ পাওয়া যাবে না। নিজেদেরই আনতে হবে।

৬। প্রতিযোগিতায় স্থানপ্রাপ্ত নাটকগুলি নিয়ে একটি সংকলন প্রতিযোগিতার প্রথম দিন প্রকাশ করা হবে।

আরও বিস্তারিত জানতেহলে
যোগাযোগ করুন
editor.ekhonduars@yahoo.com

বিশেষ জন্মাষ্টমী প্রতিবেদন

অসাধু বিনাশে যুগে যুগে আবির্ভাব হওয়ার কথা যাঁর বিপন্ন মানুষ তাঁরই অধীর অপেক্ষায় !

পিতামহ সতীশচন্দ্র মানুষটি ছিলেন খুব পরিশ্রমী ও কর্মপ্রিয়। এখন বুঝি আমার জ্ঞান হওয়া বয়সে তিনি বৃদ্ধই। ওই সত্তর অতিক্রান্ত বয়সেও সারা দিনমান তাঁকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। গোয়ালে,সুপুরি বাগানে, সব্জি খেতে যেখানেই কাজ চলুক সাদা ধবধবে ধুতি আর সাদা গেঞ্জি গায়ে দাদু সেখানেই হাজির থাকতেন;শুধু নির্দেশ দেওয়া নয় নিজেও হাত লাগাতেন। তারপর দু-চারজন রোগী বারান্দায় জমা হলে সেখানে এসে বসতেন। কিন্তু ভোরে বিছানা ছাড়বার আগেই মৃদু স্বরে দেবস্তুতি তাঁর নিত্যকর্মের মধ্যেই পড়ত। ঠাকুরঘরে তাঁকে কমই দেখেছি; প্রতিটি সকালে বাড়ি সংলগ্ন সামনের মাঠে পুবমুখো জোড়াসনে বসে আচমন, গীতাপাঠ ইত্যাদি চলত বেশ কিছুটা সময় ধরে। কোনও পূজার উপকরণ তাঁর ধারেকাছে দেখি নি কখনও, আচমনের জন্য জলও নয় ! জল নেওয়া ও ছেটানোর ভঙ্গিটুকু ছিল শুধু আর সামনে ছোট তেপায়ার ওপর কাপড়ে জড়ানো একটি গীতা। পাঠ্যবই হাতে পড়ার ভঙ্গি করে কাছেই বসে থেকেছি দাদুর পুজো শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। উনি উঠলে তবে না আবদার, তবে না মাঠেঘাটে অ্যাডভেঞ্চার ! পূজা শেষ হয়ে আসছে বোঝা যেত যখন উচ্চারণ করছেন— "গীতার মাহাত্ম্য কথা অতি পুরাতন। / স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ফল করে যে কীর্তন।।/গীতা পড়ি যে না পড়ে মাহাত্ম্য গীতার।/ গীতাপাঠ বৃথা তার বৃথা শ্রম সার।।/গীতার মাহাত্ম্য যেবা পড়ে কিম্বা শোনে।/শ্রেষ্ঠগতি লভে সেই জন শ্রদ্ধাগুণে।।/শুনিয়া গীতার ব্যাখ্যা মাহাত্ম্য যে শোনে।/সুখাবহ পুণ্যফল লভে সেই গুণে।। /বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে মাহাত্ম্য গীতার।/সমাপ্ত হইল ছন্দে সরল পয়ার।।" প্রতিদিন একটি করে অধ্যায় পাঠ করতেন তিনি। সব শব্দের অর্থ বা প্রাসঙ্গিকতা তেমন কিছু বুঝিনি তখন, কিন্তু —শ্রীকৃষ্ণ যে বিশেষ দেবতা তা মনে হত। দাদুর সেই পাঠে ছন্দের দোলা ছিল, ভালোলাগা ছিল, দূরের কোন জগতের কি এক বার্তা ছিল। নইলে এতকাল পরেও সব এমন স্পষ্ট মনে থাকবে কেন? এরপর জীবনের নানা পর্বে শ্রীকৃষ্ণকে পেলাম নানান উপলব্ধিতে !

এই উপমহাদেশের বিভিন্ন কোণেই নানা আঙ্গিকে শ্রীকৃষ্ণ চর্চা চলে আসছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আমরা পাচ্ছি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের শ্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত পঞ্চম বেদ নামে কথিত, এক লক্ষ শ্লোকে ও আঠার অধ্যায়ে বিধৃত মহাভারত মহাকাব্যে। পাচ্ছি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ১৮টি অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়। কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী

ধর্মরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে, দুষ্টের বিনাশ ও সাধুদের পরিত্রাণ কল্পেই যুগে যুগে আমি এই পৃথিবীতে আসি— ঈশ্বররূপে এই আত্মঘোষণা আমাদের চমকিত করে ! তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি একজন কৌশলী রাজনীতিবিদ? রণনীতিবিদ? দুঃসাহসী স্বপ্নদর্শী মানুষ? যিনি মানুষের জন্য একটি আদর্শ ভুবনের কল্পনা করেছিলেন?

যুদ্ধপ্রাঙ্গণে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ রূপে। চারিদিকে নিকটজনদের দেখে অবসাদগ্রস্ত ও বিষণ্ণ অর্জুন আত্মজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অনীহা প্রকাশ করলেন, এমত অবস্থায় অর্জুনের রথের সারথী শ্রীকৃষ্ণ নানাভাবে নানা যুক্তিপূর্ণ ভাষ্যে অর্জুন তথা পার্থকে অস্ত্রধারণের প্ররোচিত করেছেন। জীবন ও জগতের, জন্ম ও মৃত্যুর, কর্ম ও কর্মফলের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করছেন। অদ্ভুত প্রজ্ঞায় জানিয়েছেন কোনও ক্ষমা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, ধরিত্রীকে পাপমুক্ত করতে হলে আত্মজনের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতেই হয়। আমরা আরও দেখি দ্রোণ-বধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের পরামর্শ ও অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পরামর্শ দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। তিনি বলছেন — যখনি ধর্মের গ্লানি অধর্ম প্রভবে। /তখনি সৃজিয়া দেহ আসি আমি ভবে।। /পরিত্রাণ করিবারে যত সাধুবরে। /পাপীদের পাপভার হরিবার তরে।।

ধর্মরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে, দুষ্টের বিনাশ ও সাধুদের পরিত্রাণ কল্পেই যুগে যুগে আমি এই পৃথিবীতে আসি — ঈশ্বররূপে এই আত্মঘোষণা আমাদের চমকিত করে ! তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি একজন কৌশলী রাজনীতিবিদ? রণনীতিবিদ? দুঃসাহসী স্বপ্নদর্শী মানুষ? যিনি মানুষের জন্য একটি আদর্শ ভুবনের কল্পনা করেছিলেন? পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রামী এমন মানুষ তো আমরা দেখেছি। সেই জননেতাদের জগত সম্মান করে ভালোবাসে। যাইহোক মহাভারতের কাহিনীতে আমরা দেখি শ্রীকৃষ্ণের এই স্বপ্নের ধর্মরাজ্য স্থাপনের অন্তরায় ছিলেন অনেকেই, তারমধ্যে সর্বাগ্রে নাম করা যায় মহাশক্তিশালী মগধরাজ জরাসন্ধ ও চেদিরাজ শিশুপালের।

প্রবল আত্মবিশ্বাসী প্রকৃত এক নেতার মতোই কৃষ্ণের উক্তি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিরস্ত্র থেকে অংশগ্রহণ। নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করে উস্কানি দিয়ে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে ফায়দা তোলা নয়। বরং নিজে নিরস্ত্র অবস্থায় ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রকৃত বীর ও শস্ত্রবিশারদ অর্জুনকে তার কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করে এই ন্যায়যুদ্ধে প্রণোদনা যুগিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। সারথি হিসেবে তাঁর রথের রশিটি নিজহস্তে ধারণ করেছেন। আর কৃষ্ণের সে উপদেশাবলী শোককাতর, জগতের মোহমায়া জালে আবদ্ধ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত হলেও গীতা পাঠে মনে হবে এ জগতের সকল মানুষের জন্যে চিরকালীন এক বার্তা দিতে চাওয়া বৈ তো নয়। জাগতিক চাওয়া পাওয়া ও নানা বিকারে কাতর মানবাত্মার গ্লানি দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই যেন গীতার শ্লোকগুলি রচিত ! মা ফলেষু কদাচন —কর্ম করে যাও ফলের আশা কর না। 'কর্মে অধিকার তব ফলে কিন্তু নয়।/কর্মলাসক্তি যেন জন্মে না তোমায়।।' এমন মনোভাব আয়ত্ব হলে মন শান্ত থাকবারই কথা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কথিত এইসব বাক্যবন্ধ আজও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। ভয়ানক অবক্ষয়ী আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপর, আত্মপ্রচারে নিবিষ্ট এ যুগেও গীতা কতিপয় মানুষের জীবনবেদ। আজও নিত্য পঠিত হয় কোনও কোনও

বাড়িতে, মন্দিরে, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। যদিও প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম ও কর্তব্য বিষয়ক কথাই গীতার সাতশ শ্লোকের মূল উপজীব্য কিন্তু সাধারণের মধ্যে ধারণা খানিকটা নেতিবাচকই— 'ওটি ধর্মগ্রন্থ বুড়োবয়সে পাঠ করতে হয়, তাতে পুণ্যলাভ হয়' অথবা 'আমি ভাই নাস্তিক ওইসব ধর্ম-টর্মের মধ্যে থাকি না' জাতীয়ই। তবে দিনমান মহাব্যস্ত নেটফ্লিক্স এইযুগ, গীতার প্রকৃত বার্তা কতখানি ও কেন গ্রহণ করবে - বড় প্রশ্ন বটে।

এ যুগের রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবারের অঙ্গেও গভীর অসুখের চিহ্ন প্রকট! একে মাৎস্যন্যায়ও বলা চলে। আজ সমাজের স্তরে স্তরে আত্মধ্বংসী রোগ! আত্মপরতা, হিংসা, জিঘাংসা, হত্যা ব্যাভিচার ক্ষমতালোভ, মিথ্যাচার, ধনলোভ, নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাকার বহুবিধ নেতির প্রাবল্য। গীতার বার্তা পারবে কি আজকের সময়কে সঠিক পথ দেখাতে? আর এ প্রসঙ্গে কেন যে মনে আসছে যদুবংশ ধ্বংসের আখ্যান! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের জীবনের উপান্তে দেখে গেছেন নিজকুলের আত্মধ্বংসী লড়াই ও বিনষ্টি। সুরাপানে মত্ত, স্বভাবে উশৃঙ্খল যাদবেরা নিজেরাই পরস্পরকে হত্যা করে ও যদুবংশ ধ্বংস করে। পরবর্তীতে দ্বারকা নগরী সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

আবার ফিরি আমার নিজের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি বিষয়ে দুচার কথায়। প্রথম পর্বে ছিল ত দাদুর ওই গীতাপাঠ, তারপর আমার জন্মগ্রামের প্রসঙ্গ। পাশের গোস্বামীবাড়িতে ভক্তসমাগমে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনটি সাদা সরল গ্রাম্য রীতিতে পালিত হত প্রতিবছর। পূজা, কীর্তন গীতাপাঠ, প্রসাদ ভক্ষণ তো ছিলই কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তিটিও ছিল চমৎকার। সব মিলিয়ে ভালো লাগা। তারপর গ্রাম ছেড়ে হাইস্কুল, রাত গভীর হলে হোস্টেল থেকে শোনা যেত দূর থেকে ভেসে আসা বৈশাখের অষ্ট প্রহরব্যাপী সংকীর্তনের সুর আর বংশীধ্বনি। সত্যি সুরেলা কণ্ঠ ছিল অদেখা সেসব গায়কের। সেই তরুণ বয়সে বাঁশি শুনে মনে হত শ্রীকৃষ্ণ ত আরও মধুর সুরে বাঁশি বাজাতেন আর রাধা ছুটে যেতেন যমুনার তীরে, কদম্ব বনে? আহা, দারুণ তো! সারাদিনের শ্রমসাধ্য কাজের শেষে এখনও গ্রামে গঞ্জে শহরতলিতে কীর্তনের আসর কিন্তু আজও বসে যথারীতি, এই নেট জেটের যুগেও। এই জেলাশহরের বাড়ি থেকে এ বছরের বৈশাখেও শুনেছি কীর্তন। তবে তার সবই যে প্রাণমাতানো সুর তা আর বলতে পারছি না!

বাংলা কাব্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাস কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না। চৈতন্য জীবনী নিয়ে বহু পদকর্তা পদ রচনা করে গেছেন। আমাদের সমাজে বহুপুরাতন সেই চতুর্বর্গ ও শ্রেণীবিভাজনের চতুর চক্রান্তে হিন্দুসমাজ কাঠামোয় যখন ঘুণ ধরেছে তখন বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের ধারায় চৈতন্য প্লাবিত করলেন বাংলার মানুষের পলল মনোভূমি। তারই হাত ধরে ভক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত। তিনি মানুষের মহিমাই প্রচার করেছেন। নগরসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মানুষকে মেলাতে চেয়েছেন। কৃষ্ণের নরলীলাকে সর্বোত্তম লীলা বলেছেন। বর্ণভেদকে তুচ্ছ করেছেন। বলেছেন কৃষ্ণের ভজনা করলে মুচিও শুচি হয়। যবন হরিদাস ছিল তাঁর প্রধান শিষ্য। তাঁর এই ভক্তিভাব আন্দোলনে কৃষ্ণনাম সপ্রেমে উচ্চারিত হয়েছে বারংবার। প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে জনগণ। মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে বিপুল শক্তি হয়ে ওঠে, কায়েমী স্বার্থের সুফলভোগী জনেরা সে শক্তিকে ভয় পায়, আতংকিত হয় এবং শক্তির উৎসস্থলটিকে বিনষ্ট করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। আমরা দেখি বাংলাকে ভাবরসে আপ্লুত করে চৈতন্যদেব চলে গেলেন উড়িষ্যায় এবং প্রেমধর্মের প্রচারক কৃষ্ণপ্রেমী মানুষটির রহস্যমৃত্যু হল সেখানেই।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রটিতে কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের জীবনী উপজীব্য করে বহু কাব্য রচিত হয়েছে। বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কিছু পদ স্নাতক শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল। সুমধুর সে পাঠ অনুভব সুগন্ধী চন্দনের মতো এখনও অন্তরে জড়িয়ে। বিদ্যাপতির মিলন পিয়াসী রাধা বলে, "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু /পেখলু পিয়ামুখচন্দা।/ জীবনযৌবন সফল করি মানলু/দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা।।" অথবা জ্ঞানদাসের রচনা— "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে

গীতার বার্তা পারবে কি আজকের সময়কে সঠিক পথ দেখাতে? আর এ প্রসঙ্গে কেন যে মনে আসছে যদুবংশ ধ্বংসের আখ্যান! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের জীবনের উপান্তে দেখে গেছেন নিজকুলের আত্মধ্বংসী লড়াই ও বিনষ্টি। সুরাপানে মত্ত, স্বভাবে উশৃঙ্খল যাদবেরা নিজেরাই পরস্পরকে হত্যা করে ও যদুবংশ ধ্বংস করে। তাঁকে দেখি মহাভারতের রাজনীতিক ও যোদ্ধারূপে, ভক্তবৎসল ভগবানরূপে, দার্শনিক বক্তা রূপে, শ্রীরাধার প্রেমিক রূপে, সুদামার কাহিনীতে বন্ধুবৎসল অপূর্ব মানুষ রূপেও।

গুণে মন ভোর।/প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।/হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।/পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্দে।।" —শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন রাধার কাতর অভিলাষ।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ আর মৌলিক মানবধর্মের জয়গান বৈষ্ণবসাহিত্যে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য উভয়েই নিজ নিজ জীবনে নতুন পথ ও মত আবিস্কার করেছেন। যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন— বহুজন হিতায় ... বহুজন সুখায়। রাধা ও কৃষ্ণের নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়, মন্দিরে পূজিত হন যুগলে। কিন্তু রাধা তাঁর প্রেমিকা স্ত্রী নন। কৃষ্ণপত্নী রুক্মিনী, সত্যভামা, জাম্ববতী, সুশীলা, লক্ষণা ইত্যাদিরা নন, আজও মন্দিরে পূজা পান রাধা-কৃষ্ণ যুগলে। তাহলে সাহিত্যে ও সাধারণ্যে প্রকৃত প্রেমের স্বীকৃতি রয়েছে ভারতে। বয়সেও অনেকটাই বড় কৃষ্ণের চেয়ে রাধা! তা এহেন ভারতবর্ষে প্রেমে সামাজিক ও পারিবারিক বাধা তথা পরিবারের সম্মানরক্ষার নামে অনার কিলিং হয় কী ভাবে? ভাবার বিষয়, এই দ্বিচারিতা কেন?

কিংবা শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ রাজবধূ রাজকন্যা মীরাবাঈয়ের কথা যদি বলা যায়? রাজসুখ প্রাসাদ সর্বস্ব ত্যাগ করে বহুদূর পথ পরিক্রমা করে ধূলিধূসরিত পায়ে কেন হাজির হন কৃষ্ণের প্রথম লীলাস্থল যমুনা তীরের বৃন্দাবনে? কণ্ঠে স্বরচিত সুললিত সংগীত "মেরে তো গিরিধারি গোপাল, দুসরো না কোই ..."! উচ্চারণ করেন কেন— "মীরা দাসী জনম জনম কি..."? কী সেই ভক্তি-ভালবাসা? একি ভারতাত্মার নিজস্ব বিশেষ স্বর —ভোগ নয় ত্যাগ? আজকের এই ভোগবাদী ভারতবর্ষ কি স্বকণ্ঠ, সচেতনা আপন আত্মার নিজস্ব স্বরটি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে?

আমরা সাধারণজন এখনও সহজেই বলি— রথযাত্রা মানে বৃষ্টি হবেই; জন্মাষ্টমী মানে বৃষ্টিতো একটু হবেই। কোন বিশ্বাস থেকে এমন বলি? জন্মাষ্টমীর বৃষ্টি নিয়ে আমাদের মনে কি এখনও কৃষ্ণের সেই অলৌকিক জন্মকাহিনীর মিথ কাজ করে? মথুরারাজ উগ্রসেনের

Lataguri Tour & Travel

Lataguri
Gorumara National Park
Jalpaiguri

Dooars Hotel Booking plus Tour Planning, Car Booking.
Darjeeling Hotel plus Car Booking.
Bhutan Hotel plus Car Booking.

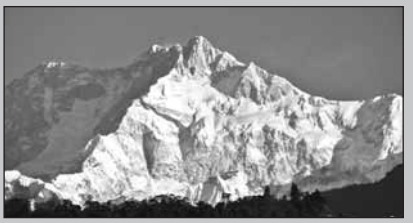

BUBAI RAY
WhatsApp No.
9932017340
Contact No.
7797329740

পুত্র কংস অতি দুর্দান্ত, অত্যাচারী ছিলেন। পিতাকে বন্দী করে নিজেই সিংহাসনে বসেন। বোন দেবকীর সঙ্গে বাসুদেবের বিয়ে দেন। কিন্তু সেসময় দৈববানী শোনেন, দেবকীর গর্ভজাত সন্তানের হাতেই তার মৃত্যু হবে। সুতরাং দেবকী ও বাসুদেবকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন। সে কারাগারে দেবকীর সন্তানদের একে একে হত্যা করা হয়; অষ্টম গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর জন্মকালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হল। মহামায়ার মায়াতে সমগ্র মথুরাপুরী ঘুমিয়ে পড়ল। বাসুদেব সুকৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দগৃহে যশোদার কাছে রেখে, যশোদার সদ্যোজাত কন্যাটিকে দেবকীর পাশে এনে রাখলেন। পরদিন কংস

মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে বিপুল শক্তি হয়ে ওঠে, কায়েমী স্বার্থের সুফলভোগী জনেরা সে শক্তিকে ভয় পায়, আতংকিত হয় এবং শক্তির উৎসস্থলটিকে বিনষ্ট করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। আমরা দেখি বাংলাকে ভাবরসে আপ্লুত করে চৈতন্যদেব চলে গেলেন উড়িষ্যায় এবং প্রেমধর্মের প্রচারক কৃষ্ণপ্রেমী মানুষটির রহস্যমৃত্যু হল সেখানেই।

সেই কন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, সেই কন্যা আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং যাওয়ার আগে বলে যায়, আমি মহামায়া, তোমাকে যে বধ করবে সে নিরাপদে গোকুলে বড় হচ্ছে। পরবর্তীতে নানা ঘটনায় কংস তার সম্ভাব্য হত্যাকারীকে চিহ্নিত করে এবং পূতনা, বক, অঘ, অরিষ্ট ইত্যাদি দানবদের পাঠায় শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্যে। কিন্তু এরা সবাই কৃষ্ণের হাতে বধ হয়। এই বাল্যকালেই কালীয়নাগকে দমন করে কালিন্দীর জলকে বিষমুক্ত করেন কৃষ্ণ। এমন নানা ঘটনা কৃষ্ণের বাল্যকাল জুড়ে। পরে বৃহত্তর কর্মের আহবানে বৃন্দাবন রাধা ও তার সখি, যমুনা, অভিসার কুঞ্জ সব ত্যাগ করে চলে যান মথুরায়।

আসি এবার জন্মাষ্টমীর ব্রত উদযাপনের নিয়মরীতি প্রসঙ্গে। বলা হয়, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এই ব্রত পালন করতে পারে। ব্রতের আগের দিন হবিষ্যান্ন খেয়ে সংযমী হয়ে থাকতে হবে। ব্রতের দিন উপবাসী থেকে রাত্রে পূজা দিয়ে পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে প্রসাদ নিতে হবে। ব্রতের উপকরণগুলি হল তিল, ফুল, তুলসী, দুর্বা, ধূপ, দীপ, পঞ্চগব্য, পঞ্চগুড়ি, আলোচালের নৈবেদ্য, ফলের নৈবেদ্য, কাঠ, বালি, মধুপর্কের বাটি, আসন, অঙ্গুরি, পূর্ণপাত্র, দধি, মধু, চিনি, তেল হলুদ ইত্যাদি। এই ব্রতের ফল কী? এই ব্রত পালন করলে সকল পাপ ধুয়ে মুছে যায়। মহাপাপীও নরক দর্শনজনিত পাপ থেকে মুক্ত হয় ও অন্তিমে নারায়ণের পাদপদ্মপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মিথ নাকি রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবৎকাল জুড়েই অতিলৌকিক ঘটনাবলীর ঘনঘটা। মথুরা নগরে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, রাত্রির মধ্যযামে মাতা দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের আগমন। মথুরা নগরের অত্যাচারী রাজা তথা দেবকীর জ্ঞাতিভ্রাতা কংসের কারাগারে অতি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জন্ম হয়েছিল এক যুগন্ধর পুরুষের। হাজার হাজার বছর ধরে যাকে নিয়ে চর্চা চলছে। সাধারণ মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু দীর্ঘ আয়ুষ্কাল ধরে এবং অতিমানবীয় যাপিত জীবন ও কর্মকান্ডের জেরে তাঁর চরিত্রে ক্রমে আরোপিত হয়েছে দেবত্ব। দেবতা রূপেই পূজিত হন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর জন্মতিথিতে আজও সমান আগ্রহে ও উদ্দীপনায় ভালোবাসা ও ভক্তিতে পালিত হয় জন্মাষ্টমী। আজও ঘরে বসেই আমরা দেখি টিভি চ্যানেলগুলি শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ও জীবনের প্রথম পর্বের লীলাক্ষেত্র মথুরা ও বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত জন্মাষ্টমীর লাইভ টেলিকাস্ট দেখাচ্ছে। মহাভারতের কাহিনী নিয়ে টিভি সিরিয়ালও কম জনপ্রিয় হয় নি। শিল্পীর তুলিতে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিহার, ময়ূর, যমুনা নদী, কদম্ব বন, ফুলের দোলনা আমাদের অন্য এক রোমান্সের স্বাদ দেয়। রাগপ্রধান বা ভজন গানে, নৃত্যের ব্যঞ্জনায় রাধা-কৃষ্ণ এখনও সমান প্রাসঙ্গিক।

শ্রীবিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের জীবনের প্রথম একাদশ বছর কাটে ব্রজধাম বা বৃন্দাবনে। মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মামা কংসকে নিহত করে রাজা উগ্রসেনকে কারামুক্ত করে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপিত করেন; নিজেদের মা-বাবাকেও কারামুক্ত করেন। এরপর সান্দীপন নামের এক বেদজ্ঞ ঋষির কাছে পাঠগ্রহণ। তাঁর জীবনের নানা পর্বে —যুদ্ধ, প্রেম, বিবাহ, সন্তান, যুদ্ধবিমুখতা, বহুদূর দ্বারকানগরে গমন ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনার ঘনঘটা। তাঁকে দেখি মহাভারতের রাজনীতিক ও যোদ্ধারূপে, ভক্তবৎসল ভগবানরূপে, দার্শনিক বক্তা রূপে, শ্রীরাধার প্রেমিক রূপে, সুদামার কাহিনীতে বন্ধুবৎসল অপূর্ব মানুষ রূপেও। গুজরাট ভ্রমণকালে গভীর কালোজলের এক বিরাট সরোবর দেখেছিলাম। গাইড বলেন, "বৃন্দাবন থেকে পদব্রজে আগত গোপিনীদের আগমন বার্তা শুনে অধীর শ্রীকৃষ্ণ খনন করান এই সরোবর। পথশ্রমে ক্লান্ত গোপিনীদের তিনি নিজ হাতে সেবাদান করেন।" ভাল লেগেছিল এই কাহিনী। মহাভারতে দ্রৌপদীর প্রিয় সখা কৃষ্ণকে দেখি। পাঁচ-পাঁচজন মহাবলশালী স্বামী থাকা সত্বেও ঘোর বিপদে সখা কৃষ্ণকেই স্মরণ করেছেন পাঞ্চালী। একইসাথে প্রবল পৌরুষ আবার মায়া, করুণা ও সেবাভাবের সমন্বয়ে ভরসা করবার মতোই চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের। আমজনতার কাছে প্রিয়তর হয়ে উঠবার, প্রকৃত নেতা হবার সব গুণই তাঁর মধ্যে দেখি।

অত্যাচারী কংসের হাত থেকে এই ধরিত্রীকে রক্ষা করবার জন্য আজ তাঁর আগমনের সময় তো অতিক্রান্ত প্রায়! বিপর্যস্ত বিপথগামী জীর্ণ মানুষের আকুল প্রশ্ন, কেবল কি কাহিনিতে শ্লোকে কিংবা মন্দিরে মন্দিরে মূর্তি হয়ে থেকে যাবেন শ্রীকৃষ্ণ? অসাধু বিনাশের জন্য তাঁর তো যুগে যুগে হাজির হওয়ার কথা! তাঁকে ঘিরে যে ধর্মের নামে অধর্মের বেসাতি চলছে তা ভুল প্রমাণ করতেও তো প্রয়োজন তাঁকে? কবে পুনরায় আবির্ভাব হবে তাঁর, কবে? বিপন্ন এই পৃথিবী যে অধীর অপেক্ষায় রয়েছে!

তনুশ্রী পাল

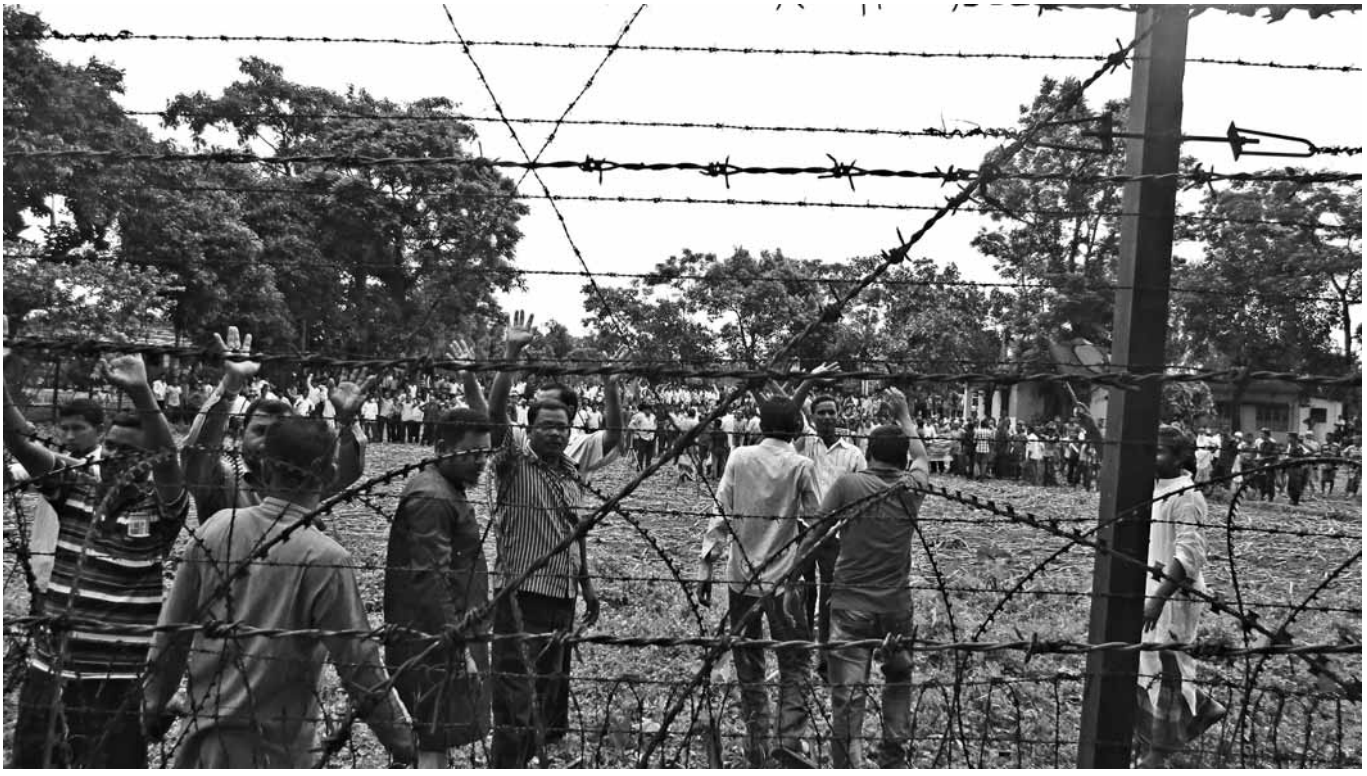

বাংলাদেশ সীমান্তে

আমার মেখলিগঞ্জ শহর

১৯৫০ সালে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পেলে প্রান্তিক মেখলিগঞ্জ একটি মহকুমাতে পরিণত হয়। এই শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কোচবিহার রাজার একাধিক নিদর্শন। যদিও শতাব্দী প্রাচীন এই নিদর্শনগুলির বেশিরভাগের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে। সেকারণে এই শহরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চাইছেন এই নিদর্শনগুলি সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হোক। তা নাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মও বঞ্চিত হবে সেই বর্ণময় যুগের স্মৃতিচিহ্ন থেকে। এক সময় পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের পক্ষ থেকে শতাব্দী প্রাচীন নিদর্শনগুলির তথ্য সংগ্রহও শুরু হয়। সে সময়ের নর্থ বেঙ্গল ইউনিভারসিটির হেরিটেজ প্রোজেক্টের কো অর্ডিনেটর ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যানকে মেখলিগঞ্জ মহকুমার প্রাচীন নিদর্শনগুলির একটি তালিকা দিয়েছিলেন। তাতে ছিল মেখলিগঞ্জ শহরের মদনমোহন মন্দির, নাট মন্দির, মহকুমা শাসকের পুরনো অফিস, নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবের নাট্য মঞ্চ, মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পদ্ম পুকুর ও বাজারের চালহাটি। মেখলিগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন বাড়ি কোচবিহারের মহারাজার দেবোত্তর সম্পত্তির উপর তৈরি। এই শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরটির অবস্থা ভালো নয়। এখানে মদনমোহন দেবের নিত্যপুজো হয়। এছাড়া মন্দির চত্বরে বারোয়ারি দুর্গাপুজো ও চার দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়। মদনমোহন মন্দির চত্বরেই রয়েছে একটি নাট মন্দির। এই মন্দিরের ফলকে লেখা আছে 'গঙ্গা বিষ্ণু পাটোয়ারী কৃত নাট মন্দির, ১৩০৫ সন।' মদনমোহন বাড়ির সামনেই রয়েছে মেখলিগঞ্জের একমাত্র শিশু উদ্যানটি, যার মাঝখানে রয়েছে মেখলিগঞ্জের প্রথম অহলিকার (মহকুমা শাসক) বাবু পদ্মনাথ দাসের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯০৬ সালে খনন করা পদ্মপুকুর। পুকুরটি মজে যাওয়ায় মেখলিগঞ্জ পুরসভা সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে।

এত গেল শহরের পুরনো নিদর্শনগুলির কথা। কিন্তু তার বাইরেও ছোট্ট এই শহরের নানা ওঠাপড়া রয়েছে। এছাড়া এই শহরের উন্নয়নমূলক কাজ এক সময় টাউন কমিটির দ্বারাই পরিচালিত হত। ১৯৮৯ সালে মেখলিগঞ্জ পুরসভা গঠিত হয়। শহরের উন্নয়নের দায়িত্বভার সেসময় অ্যাডহক কমিটির হাতে ছিল। ১৯৯৩ সালে প্রথম পুরসভা নির্বাচন হয়। মেখলিগঞ্জ পুরসভার প্রথম পুরপ্রধান হন শিক্ষক দিলীপ বর্ধন চৌধুরী। সে সময় ১১টি ওয়ার্ড নিয়েই মেখলিগঞ্জ পুরসভা গঠন করা হলেও ১৯৯৮ সালের পুরভোটে দুটো ওয়ার্ড কমিয়ে ৯টি ওয়ার্ড করা হয়।

মেখলিগঞ্জ শহরেই রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন তিনটি বিদ্যালয়। ১৮৯০ সালে মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জানা যায় মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় যে সময় চালু হয় সে সময় আশপাশের মধ্যে একমাত্র দোমহনি এলাকায় কেবলমাত্র একটি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। সেকারণে পার্শ্ববর্তী এলাকার ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। তাদের জন্য বোর্ডিং ছিল। এখনও বোর্ডিং এর পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি অতীত স্মৃতি বহন করে চলেছে। ১৯১৩ সালে কোচবিহারের মহারাণী ইন্দিরা দেবীর নামে স্থাপিত হয় ইন্দিরা নিম্ন বুনিয়াদি বালিকা বিদ্যালয় ও ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। যার দ্বারা এটা বোঝা যায় শিক্ষাদীক্ষায় কতটা এগিয়ে ছিল এই শহর। কিন্তু বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের অভাবে বহু ছাত্র ছাত্রীর পড়াশুনায় ইতি পড়ত। কলেজের দাবিতে আন্দোলন জোরালো হলে ১৯৯৬ সালে মেখলিগঞ্জ কলেজ তৈরি হয়। শুরু মেখলিগঞ্জ উচ্চতর বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত বোর্ডিং এর ঘরে শুরু হলেও পরবর্তীতে মেখলিগঞ্জ শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা রাজ্য সড়কের ধারে মেখলিগঞ্জ কলেজের ভবন তৈরি হয়েছে। বর্তমানে একাধিক বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ রয়েছে মেখলিগঞ্জ কলেজে।

ভৌগলিকভাবে তিনদিক বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা মেখলিগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে বহু মানুষ আসেন। মেখলিগঞ্জ শহর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরেই রয়েছে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র তিনবিঘা করিডোর। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি রূপায়ণের পর ১৯৯২ সালে ২৬ শে জুন তিনবিঘা চুক্তি কার্যকর করা হয়।

এম এন মেমোরিয়াল হল

এই চুক্তির বিরোধিতায় এক সময়ে এই এলাকার মানুষ আন্দোলনে নেমেছিল। উত্তাল সেই আন্দোলনে তিন জন প্রাণ হারান— ১৯৮১ সালের ৬ ই জুলাই সুধীর রায় এবং ১৯৯২ সালের ২৬ শে জুন চুক্তি কার্যকরের দিন জিতেন রায় ও ক্ষিতেন অধিকারী। তিনবিঘা করিডোর চালু হওয়ার পর স্থানীয়রা এলাকার উন্নয়নের দাবি তোলেন। দাবি উঠছে তিনবিঘাকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হোক। কারণ চ্যাংরাবান্ধা, তিনবিঘা, কুচলিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ শহরে পর্যটকদের দর্শনীয় বহু স্থান রয়েছে। পরবর্তীতে এলাকায় থানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠলেও উন্নয়ন নিয়ে মানুষের এখনও ক্ষোভ রয়েছে।

মেখলিগঞ্জ শহরের উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু কিছুটা যেন ধীর গতিতে। এক সময় পথবাতি হিসেবে বাল্ব দিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে জ্বলছে এলইডি লাইট, বসেছে বেশ কয়েকটি হাইমাস্ট। রাস্তাঘাট থেকে নিকাশি ব্যবস্থা বর্তমানে অনেকটাই ভাল হয়েছে। তাছাড়া মেখলিগঞ্জ একটা সময়ে পড়াশুনায় যেমন এগিয়ে ছিল তেমনি খেলাধূলা ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অনেক এগিয়ে ছিল। সংস্কৃতির চর্চায় একাধিক সংস্থা তৈরি হয়েছিল। শহরের নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবের মাঠটিতে সারা বছর ধরে ফুটবল ক্রিকেট চলত। খেলাধুলা এগিয়ে থাকলেও একমাত্র মাঠটির বেহাল দশার কারণে সমস্যা হত। সেকারণে দাবি উঠছিল স্টেডিয়ামের। বর্তমানে ওই মাঠটির সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়েছে এবং পরিকল্পনা চলছে মিনি স্টেডিয়ামের। মেখলিগঞ্জ শহরের বর্তমানে ফুটবল ক্রিকেটের পাশাপাশি ঊষু প্রশিক্ষণ চলে। বিশেষ করে ঊষু প্রতিযোগিদের সাফল্য এলাকার পাশাপাশি রাজ্যের সুনাম বাড়িয়েছে। মেখলিগঞ্জের ঊষু এসোসিয়েশনের ছাত্রী মৌনিষা রায় কন্যাশ্রী দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছে।

মেখলিগঞ্জের এত সম্ভাবনার মধ্যেও কেন পিছিয়ে সেই কারণ খুঁজতে গিয়ে সবচেয়ে আগে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় সেগুলো হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের উপর মেখলিগঞ্জ শহর ও ব্লকের লক্ষাধিক মানুষ নির্ভরশীল। চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে অনেকেই শহর ছাড়ছেন। এছাড়া মাধ্যমিকের ফলাফলের নিরিখে এক দশক ধরে পিছিয়ে পড়ছে এই শহর। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এখনও অনেকটা পিছিয়ে মেখলিগঞ্জ।

মেখলিগঞ্জের এত সম্ভাবনার মধ্যেও কেন পিছিয়ে সেই কারণ খুঁজতে গিয়ে সবচেয়ে আগে যে সমস্যাগুলি দেখা দেয় তা হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের উপর মেখলিগঞ্জ শহর ও ব্লকের লক্ষাধিক মানুষ নির্ভরশীল। কিন্তু হাসপাতালে যে সংখ্যক চিকিৎসক প্রয়োজন তার এক তৃতীয়াংশ চিকিৎসক রয়েছে। তার ফলে সামান্য রোগের কারণেও রুগিকে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে রেফার হয়। চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ কম থাকার ফলে অনেকেই শহর ছাড়ছেন।

এছাড়া মাধ্যমিকের ফলাফলের নিরিখে এক দশক ধরে পিছিয়ে পড়েছে এই শহর। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এখনও অনেকটা পিছিয়ে মেখলিগঞ্জ। সেকারণে অন্য সব শহরে যখন প্রতি বছর লোক সংখ্যা বাড়ছে তখন মেখলিগঞ্জে কমছে। এইসব কারণেই এই এলাকার মানুষ তাকিয়ে আছেন মেখলিগঞ্জ -হলদিবাড়ি সংযোগকারী তিস্তা সেতু 'জয়ী' নির্মাণের কাজ কবে শেষ হবে সেই দিকে। সকলেরই ধারণা এই সেতু বন্ধনের কাজ সম্পূর্ণ হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি হবে, বাকি বাংলার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে, আর ঘুচে যাবে বহুকালের দূরত্ব ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের এতদিনের দুর্ভোগ-গ্লানি-অভিমান। অনেকেরই ধারণা, জয়ী সেতু চালু হয়ে গেলে হলদিবাড়ি তথা জলপাইগুড়ি শহরের সঙ্গে সড়কপথের ব্যবধান কমবে, মেখলিগঞ্জ মহকুমার শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে, একই সঙ্গে লাভবান হবে একপাশে পড়ে থাকা জলপাইগুড়ি জেলা শহরের বিবর্ণ হয়ে যাওয়া গ্ল্যামার, পড়ন্ত অর্থনীতি-বাণিজ্যও। আর খুব বেশিদিন নয়, সেই আশাতেই বুক বাঁধছে মেখলিগঞ্জের শহর ও গ্রামের মানুষ। এখানকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চেষ্টা চালাচ্ছেন শিক্ষার মান বাড়ানোর, মেখলিগঞ্জের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনবার। বেকার যুবকরা স্বপ্ন দেখে নতুন সেতু সড়ক পথে আসবে সুদিন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সীমান্তে পর্যটন কারবার রমরমিয়ে বেড়ে উঠবে, কর্মসংস্থান বাড়বে নিশ্চিতভাবে। পিছিয়ে থাকার পুরনো ব্যথা ভুলে সেই রোদ ঝলমলে দিনগুলির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে আমার প্রিয় মেখলিগঞ্জ।

স্মিতা গোপ

শতাব্দী প্রাচীন মেয়েদের স্কুল

কভার স্টোরি ২

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত পথ ‘সাবালক’ হবে কবে?

চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দারা জানালেন, এই ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকা ও সীমান্ত বাণিজ্য কেন্দ্রের উন্নয়ন নিয়ে তারা একাধিকবার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও লাভের লাভ খুব একটা হয়নি। কয়েকজন যোগ করলেন, মাঝে মধ্যেই চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত পরিদর্শনে আসনে মন্ত্রী-সান্ত্রী-সরকারি উচ্চ কর্তারা। সকলেই আশ্বাস দিয়ে যান দ্রুত কিছু করার। পত্রপত্রিকা সংবাদমাধ্যমেও এ নিয়ে কম তর্জা হয় নি! কিন্তু বাস্তবে কোনও কাজ আজও হয় নি বলেই সাধারণ মানুষের অভিমত। স্বভাবতই বিরক্তি ও হতাশার সুর স্থলবন্দর এলাকার বাসিন্দাদের। তাদের আর্জি এই স্থলবন্দর এবং ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের আধুনিকীকরণ করা হোক শীঘ্রই।

ঢালহীন তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার!

কাদের কথা বলছেন কাকা?

কার আবার? আমাদের এই চ্যাংরাবান্ধা! পৃথিবীর আর কোথায় এমন হতদরিদ্র ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দেখেছেন বলেন তো? ছবি তুলে নিয়ে যাবেন অবশ্যই। আর চ্যাংরাবান্ধার অবস্থা সেই রকমই বলতে পারেন। অনেক কিছুই হচ্ছে শোনা যায় কিন্তু চোখে দেখা যায় না!

এই বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়াতে এসে বহিরাগত উৎসুক কারও চোখে যদি ধরা পড়ে উন্নয়ন বা অনুন্নয়নের ছবি তবে তিনি খোঁজ নিতেই পারেন স্থানীয় কোনও পুরনো মানুষের কাছে, সত্যিই কতটা পাল্টেছে আগের চ্যাংরাবান্ধা! আর তার উত্তর মোটমুটি এই রকমই মিলবে বলা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হওয়ার দৌলতে মেখলিগঞ্জ ব্লকের প্রাণকেন্দ্র চ্যাংরাবান্ধা আজ উত্তরবাংলার সীমান্তে একটি গুরত্বপূর্ণ নাম কোনও সন্দেহ নেই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রতিকতম প্রশাসনিক সফরে আলিপুরদুয়ার জেলার কাজ উত্তরকন্যায় বসে সারলেও কোচবিহারের বৈঠক করতে বেছে নিয়েছিলেন চ্যাংরাবান্ধাকেই। এর আগে তাঁর চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের সিদ্ধান্তও প্রমাণ করে বৈদেশিক বাণিজ্যের এই স্থলবন্দরটির উন্নয়নে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চান। চ্যাংরাবান্ধায় রেললাইন সম্প্রসারণের ভাবনাও সেই গুরুত্বের পরিচয় বহন করছে তারও আগে থেকে। এছাড়া রাজনৈতিক ডিগবাজিতেও চ্যাংরাবান্ধা সুনাম অর্জন করেছে— নিন্দুকমহল এমন বললেও তাতে যদি আখেরে চ্যাংরাবান্ধার কল্যাণ হয় তো ক্ষতি কী! কিন্তু সম্ভাবনা ও বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে ব্যবধান যতদিন না কমে, ততদিন মানুষের মুখে যে হাসি ফোটে না— প্রত্যন্ত জনপদ চ্যাংরাবান্ধা বোধহয় তারই অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়, সীমান্ত বাণিজ্যের উপর আজ মেখলিগঞ্জ ব্লকের একটা বিপুল অংশের মানুষের আয় নির্ভরশীল। দিন দিন এই স্থলবন্দর দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্রা বাড়লেও পরিকাঠামোগত বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে আজও অনেকটাই অনুন্নত এই এলাকা। সেই বহুকাল থেকে জেলা সদরের সঙ্গে সরাসরি পরিবহণ যোগাযোগ নেই বললেই চলে। বছর তিনেক আগে রেল পরিষেবা চালু হলেও সারাদিনে শুধুমাত্র একটি ট্রেন শিলিগুড়ির মধ্যেই চলাচল করছে, চ্যাংরাবান্ধা-কলকাতা ট্রেন চালুর ন্যায্য দাবি থাকলেও সে কথায় কান দেয় কে? তাদের কথায়, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই মেখলিগঞ্জ ব্লকে কর্মসংস্থানের তেমন কোনও সুযোগ নেই। কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে থাকে বহু মানুষ। চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর এক্ষেত্রে কিছু মানুষকে আয়ের পথ দেখালেও এখানকার পরিকাঠামো উন্নয়নে তেমনভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে না বলেই অভিযোগ। নানা সমস্যার মধ্য দিয়েই চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য চলে আসছে।

অথচ ১৯৮৭ সাল থেকে কোচবিহার জেলার এই

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য চলছে। এখান দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের পাশাপাশি চলছে ভুটান-বাংলাদেশ বহির্বাণিজ্যও। বাংলাদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ভিনরাজ্য থেকে প্রচুর ট্রাক রাস্তার উপর এমনকি যেখানে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। এতে ব্যাপক যানজট বেঁধে যাচ্ছে। যানজট সমস্যা এই সীমান্তের নিত্যদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়। বাইরে থেকে আসা ট্রাকের কর্মীদের জন্যও এখানে রাত্রি কাটানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। রয়েছে শৌচাগার ও পানীয় জলের সমস্যাও। পণ্য বোঝাই ট্রাকগুলিকেও খোলা আকাশের নিচে দাঁড় করিয়ে রাখতে হচ্ছে। এতে অনেক সময় কাঁচামাল পচে গিয়ে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এইসব পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটছে বলেও অনেকে জানালেন।

সীমান্ত বাণিজ্যকেন্দ্রের পাশাপাশি এখানেই রয়েছে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট। যে চেকপোস্টের মাধ্যমে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মানুষ পাসপোর্ট নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত করছে। কিন্তু এই ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকায় দেশ-বিদেশের যাত্রীদের জন্য কোনওরকম বিশ্রামাগার, অতিথিনিবাস, পানীয় জল ইত্যাদি কোনও কিছুরই ব্যবস্থা নেই। বৃষ্টি নামলে কিংবা প্রচণ্ড রোদের সময় যাত্রীদের ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে মাঝেমধ্যেই যাত্রীদের পাসপোর্ট নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। ইমিগ্রেশন করে সীমান্ত পারাপারের সময় কোনও কারণে চ্যাংরাবান্ধায় আটকে পড়লে বা নির্দিষ্ট সময়ে সীমান্তে পৌঁছতে না পারলে যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বাড়ে। কারণ এখানে যাত্রীদের থাকার জন্য নেই কোনও হোটেল কিংবা অতিথিনিবাস। শুধুমাত্র রাতটুকু কাটানোর জন্য ভরসা সেই ৫০-১০০ কিমি দূরের জলপাইগুড়ি কিংবা শিলিগুড়ি। আর যাতায়াতের ব্যবস্থা বলতে দিনে দু-একটি বাস। এতে যেমন অতিরিক্ত পরিবহণ খরচ হয় তেমনই দেশ-বিদেশের সাধারণ যাত্রীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়, বলাই বাহুল্য।

বাসিন্দারা জানালেন, এই ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকা ও সীমান্ত বাণিজ্য কেন্দ্রের উন্নয়ন নিয়ে তারা একাধিকবার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও লাভের লাভ খুব একটা হয়নি। কয়েকজন যোগ করলেন, মাঝে মধ্যেই চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত পরিদর্শনে আসনে মন্ত্রী-সান্ত্রী-সরকারি উচ্চ কর্তারা। সকলেই আশ্বাস দিয়ে যান দ্রুত কিছু করার। পত্রপত্রিকা সংবাদমাধ্যমেও এ নিয়ে কম তর্জা হয় নি! কিন্তু বাস্তবে কোনও কাজ আজও হয় নি বলেই সাধারণ মানুষের অভিমত। স্বভাবতই বিরক্তি ও হতাশার সুর স্থলবন্দর এলাকার বাসিন্দাদের। তাদের আর্জি এই স্থলবন্দর এবং ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের আধুনিকীকরণ করা হোক শীঘ্রই। আধুনিকীকরণ হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আরও গতি আসবে। শিলিগুড়ি বা কোচবিহার থেকে ট্রেনে বা বাসে চ্যাংরাবান্ধা যাতায়াতের পথ সুগম হলে, যাত্রীদের বিশ্রামের সুব্যবস্থা হলে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়েও যাত্রীদের যাতায়াত বহু গুণে বাড়বে। যাত্রী সংখ্যা বাড়া মানেই পর্যটন বাণিজ্যের বিকাশ, আর স্থানীয় খেটেখাওয়া মানুষের সংস্থান বৃদ্ধি। কিন্তু এই সহজ অঙ্কটি নিয়ে আজ পর্যন্ত নেতারা কেউ মাথা ঘামান নি কেন সেটাই মাথায় ঢোকে না চ্যাংরাবান্ধার মানুষের।

জনৈক স্থানীয় শিক্ষকের ব্যাখ্যার মধ্যে অবশ্য বেশ বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। একটা সময় স্মাগলিং বেআইনি যাতায়াত এসব নিয়েই থাকত এইসব সীমান্তের জনপদগুলি, তাকে কেন্দ্র করেই চলত স্থানীয় অবৈধ অর্থনীতি, বাকি পৃথিবীর চোখের আড়ালেই। এখানকার মানুষ দীর্ঘকাল সেটাই সীমান্তের যাপন বলে মেনে নিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ ও চলাচলের পথ খুলে যাওয়ায় সেসব খানিক পরিবর্তন ঘটল, যদিও পাচার কারবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই দাবি কেউ করবেন না কেউই। রাজনৈতিক শৃগালদের স্বার্থ বজায় রাখতে সেসব চলছে চলবে! অনুপ্রবেশজনিত জনস্ফীতি কৃষক পরিবারের ছেলেদের বাধ্য করেছে ভিনরাজ্যে সংস্থানের পথে বেরতে, আর দান-ধ্যানের আধুনিক রাজনীতি বাকিদের হয়ত সাময়িক নিরস্ত রাখতে সমর্থ হয়েছে! কিন্তু এসব সত্বেও নতুন প্রজন্মের একটা বিরাট অংশ যাদের বাইরে যাওয়ার কিংবা বেআইনি কাজকর্মের মুরোদ কোনওটাই নেই তারা আজও তাকিয়ে আছে সুস্থ পথে খেটে খাওয়ার আশায়। কিন্তু মুশকিল হল নেতা-মন্ত্রীকুল যেসব কাজে নিজেদের 'কিছু' হয় না সেসব কল্যাণকর রাজনীতিতে অভ্যস্ত বা ইচ্ছুক কোনওটাই যে নয়! সাধারণ মানুষের সংস্থানই যদি হয়ে যায় তবে আর নেতাদের বাহুবল বাড়াতে হাজির থাকবে কে বলুন?

মাস্টারমশাই তাই চ্যাংরাবান্ধার একটি মজার ব্যাখ্যা দিতে চান। 'চ্যাংরা' কথাটির স্থানীয় অর্থ হল নাবালক। তাঁর মতে, সম্ভবত সেই সব নেতাদের আন্তরিক ইচ্ছাই হল সীমান্তের এই জনপদ 'চ্যাংরা'-ই থেকে যাক, স্বনির্ভর সাবালক যতদিন না হয় ততদিনই মঙ্গল!

নিজস্ব প্রতিবেদন

সীমান্তে আজ উজ্জ্বল গ্রামীণ মেখলিগঞ্জ

স্বনির্ভর গ্রুপের সভা

কোচবিহার মহারাজাদের রাজত্বে ছোট একটি পরগনা ছিল মেখলিগঞ্জ, তৎকালীন নাম ছিল ১-নং দেওড়া পরগনা। ১৯৪৮ সালের ২০ আগষ্ট এই অঞ্চলের ইতিহাস চিরতরে বদলে গেল। চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ভারত সরকারের সাথে তৎকালীন কোচবিহারের মহারাজার। ১ নং দেওড়া পরগনার পুনর্জন্ম হল, পরগণা হল নতুন জেলা কোচবিহারের একটি মহকুমা, নাম হল মেখলিগঞ্জ। দুটি ব্লক নিয়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমার যাত্রা শুরু ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে। মেখলিগঞ্জ ছাড়া অপর ব্লকটি হলদিবাড়ি। এই দুটি ব্লকের মাঝ বরাবর বয়ে চলছে কল্লোলিনী তিস্তা। আর এতেই যত বিপত্তি। যেখানে মেখলিগঞ্জ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ থেকে মহকুমার দূরত্ব এগারো কিলোমিটার, সেখানে হলদিবাড়ি থেকে সড়ক দুরত্ব বর্তমানে পঁচাশি কিলোমিটার। এর ফলে বেশ কিছু প্রশাসনিক জটিলতার অবকাশ থেকে গিয়েছে। এর প্রধাণ কারণ হল নদীর ওপর দিয়ে কোনও সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকা। নদীর এপারে দাঁড়ালেই অপর পারটি পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। কিন্তু মাঝে নেই কোনও সেতু। অগত্যা সেই জলপাইগুড়ি ঘুরে ময়নাগুড়ি হয়ে মহকুমায় আসতে হয় হলদিবাড়ির মানুষদের।

তবে আর বেশিদিন নয়, সেতু বন্ধনের কাজ শুরু হয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে নির্দেশে বিগত দেড় বছর ধরে মহকুমা এবং দুটি ব্লক প্রশাসন, ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ২৩ একর জমি অধিগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। পৌরসভা এলাকায় জমি অধিগ্রহণ সহজ কাজ না হলেও

বিডিও-র কলমে

মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবেই এগিয়ে এসেছেন এই অতিকাঙ্খিত উন্নয়নের স্বার্থে। পূর্তবিভাগ দ্রুত কাজ করছে, আশা করা যায় আর বছর খানেকে মধ্যেই এই সেতুটি সম্পুর্ণ হয়ে যাবে। পাঁচ কিলোমিটার লম্বা এই সেতুটি মেখলিগঞ্জের পৌরসভার পেছন থেকে শুরু হয়ে তিস্তার ওপর দিয়ে হলদিবাড়ির বেলতলিতে গিয়ে শেষ হবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই সেতুটির নামকরণ করেছেন 'জয়ী' সেতু।

এই মেখলিগঞ্জ নামকরণ নিয়েও বেশ খানিকটা আবেগ জড়িত আছে। লোকমুখে প্রচারিত যে, মেখলিগঞ্জ তার নামটি পেয়েছে 'মেখলা' থেকে। 'মেখলা' তৈরি এই অঞ্চলের একটি অতি প্রাচীন কুটির শিল্প। পাট বা সুতো দিয়ে তৈরি একধরনের মাদুর বা সতরঞ্চী এই অঞ্চলে 'মেখলা' নামে পরিচিত। বর্তমানে মেখলা শিল্প তার জৌলুশ হারিয়েছে অনেকটাই। বিভিন্ন স্বনির্ভর দলের মহিলাদের একত্রিত করে এই মুমূর্ষু শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। কিন্তু চাহিদার অভাবই আজ এর মূল অন্তরায়।

বাংলাদেশ সীমান্তে

১৫২টি মৌজা, ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই মেখলিগঞ্জ উন্নয়ন সমষ্টি, যার মধ্যে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এবং তার মধ্যে আনুমানিক ৬০ কিলোমিটার সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়াহীন। এই কারণে এই সীমান্তটিকে Porus Border বলা হয়। গরুপাচার এবং অবৈধ সীমান্ত পারাপার এখানকার বড়সড় সমস্যার মধ্যে অন্যতম। ৩৪ টি বর্ডার আউট পোষ্ট আছে এই উন্নয়ন সমষ্টিতে। একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে এখানে হাড়িকামাত, কলসি, এবং চামড়াভিটা নামক তিনটি গ্রাম আছে যেগুলি কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে অবস্থিত। এছাড়াও সতী, সানিয়াজান, সুটুঙ্গা, ধরলা, জলঢাকা, ধারাইখুড়ি ও তিস্তা নদী এই ব্লকের মধ্য দিয়ে

১৫২টি মৌজা, ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই মেখলিগঞ্জ উন্নয়ন সমষ্টি, যার মধ্যে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এবং তার মধ্যে আনুমানিক ৬০ কিলোমিটার সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়াহীন। গরুপাচার এবং অবৈধ সীমান্ত পারাপার এখানকার বড়সড় সমস্যার মধ্যে অন্যতম। ৩৪ টি বর্ডার আউট পোষ্ট আছে এই উন্নয়ন সমষ্টিতে। একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে এখানে হাড়িকামাত, কলসি, এবং চামড়াভিটা নামক তিনটি গ্রাম আছে যেগুলি কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে অবস্থিত।

প্রবাহিত। অন্যদিকে পাইলাভাসা ও খারুভাজ নদী বুঁজে গিয়ে এখন বোরো চাষের উপযোগী জমিতে পরিণত হয়েছে।

তিনবিঘা কথা

এখানে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সুবিখ্যাত ও সর্বজনবিদিত তিনবিঘা করিডোর এই ব্লকেই অবস্থিত। এই করিডোরের একদিকে দহগ্রাম নামক বাংলাদেশি ছিটমহল এবং অপরদিকে বাংলাদেশের মূল ভুখণ্ডের দিকে লালমনিরহাট জেলা। দহগ্রাম ছিটমহলে যে পাঁচ হাজার পরিবার বসবাস করে, মূল ভুখণ্ডে তাদের যাতায়াতের একটি মাত্র পথ এই তিনবিঘা করিডোর। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে এই সংবেদনশীল জায়গাটিতে। এই নামকরণের নেপথ্যের কাহিনিটি হল আনুমানিক তিনবিঘা পরিমাণ জমির উপর করিডোরটি দাঁড়িয়ে। এই করিডোরের চারপ্রান্তে চারটি জাতীয় পতাকা প্রতিদিন উত্তোলন করা হয় এবং সূর্যাস্তের সময় তা নামিয়ে নেওয়া হয়। মাস ছয়েক আগে অবধি একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মানপূর্বক এই চারটি জাতীয় পতাকা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা নামিয়ে আনতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটি বন্ধ রয়েছে। তিনবিঘাতে প্রতিদিন বহু পর্যটক জমায়েত হন দুই দেশের সীমান্ত ও সীমান্তবর্তী মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখার জন্য। দেশভাগের সময় অনেকেই যারা এপারে চলে এসেছিলেন তাদের মধ্যে বেশি আবেগ চোখে পড়ে। তিনবিঘাকে সাজিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্লক প্রশাসন একটি কমিউনিটি হল, পর্যটকদের বসার জন্য জায়গা, শৌচাগার, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত এবং সঠিক সৌন্দর্যায়নের মত কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে কমিউনিটি হলটির নির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

ছিটমহল

২০১৫ সালের ২৩ শে জুলাই থেকে ৩১শে জুলাই এর মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয়। মেখলিগঞ্জ ব্লকে এরই ফলস্বরূপ মোট ১১টি ছিটমহল অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই সাথে ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি এনক্লেভ সেটেলমেন্ট ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এই ক্যাম্পে শুরুতে ৪৭টি পরিবার এলেও বর্তমানে ৪৬টি পরিবার বসবাস করে। এরা বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অন্তর্গত ভারতীয় ছিটমহল বাঁশকাটা, হাতিবান্ধা এবং বাঁশদহের বাসিন্দা ছিলেন এবং ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে বসবাস করার আগ্রহ প্রকাশ করাতে তাদের মূল ভূখণ্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বেই সকল ছিটমহলবাসীকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুসারে নির্বাচন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সাথে সাথে ভোটার কার্ডও প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তারা প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন ছিটমহলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কমিউনিটি হল, শৌচালয়, পলিহাউস, সৌরচালিত সেচ ব্যবস্থা, ভার্মিপিট, যোগাযোগকারী রাস্তা এবং পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা সম্পন্ন হয়েছে। সেটেলমেন্ট ক্যাম্পবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য নতুন আবাস নির্মাণ কার্য দ্রুত গতিতে শেষ করার প্রক্রিয়া চলছে। তৎকালীন

ছিটমহলবাসীরা এখন নব্যভারতীয়। তাদের কর্মসংস্থানের জন্য ১০০ দিনের কাজ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, স্বনির্ভর দল গঠন এবং তার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক লোন প্রদানের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে প্রতিমাসে রেশন, পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি তিন মাস অন্তর এই ক্যাম্পে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিনোদনের জন্য ছায়াছবি প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করা হয় প্রায়শই। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হিসাবে প্রতিটি পরিবারের সাথে আজ আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ছেলেমেয়েকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। যোগ্যতাসম্পন্ন সকল ছাত্র ছাত্রীকে সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেল এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তপশিলী জাতি ও উপজাতি শ্রেণিভুক্ত মানুষকে শংসাপত্র দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু সরকারি বিভিন্ন অবসরকালীন ভাতার আওতায় ছিটমহলবাসীদের আনা এখনও সম্ভব হয়নি। ২০০৫ সালে রুরাল হাউস হোল্ড সার্ভে এবং ২০১১-১২ সালে সোসিও ইকোনোমিক কাস্ট সেন্সাস করা হয়। এই দুইটি সার্ভের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সব সরকারি অবসরকালীন ভাতা এই দুইটি সার্ভের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু ছিটমহল বিনিময়ের পরে হয়েছে, তাই ছিটমহলবাসীদের এই সকল ভাতার আওতায় আনা এখনও সম্ভব হয়নি, কিন্তু তার প্রচেষ্টা চলছে।

নারীদের স্বনির্ভরতা

বিগত দুই বছরে ব্লক প্রশাসনের যাবতীয় কার্যাদির মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য যে প্রকল্পগুলি পেয়েছে তার মধ্যে নারী স্ব-শক্তিকরণ হল অন্যতম। এই সময়ের মধ্যে ২৮৭০টি স্বনির্ভর দল গঠন করা হয়েছে। এই স্বনির্ভর দলগুলি প্রাথমিক ভাবে উপসংঘ এবং সংঘের অধীনস্থ থাকলেও সমবায় সমিতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই স্বনির্ভর দলগুলিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন। ১২০৯টি দল কে হাঁস ও মুরগির ছানা পালনের জন্য প্রদান করা হয়। মৎস্য দপ্তরের সহায়তায় একটি দলকে আট বিঘা পুকুর খনন এবং মৎস্য পালনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এছারাও ৬৫টি দলকে মুরগি পালনের ঘর ১০৩টি দলকে জৈব সার তৈরির কৃত্রিম পীট এবং চারটি দলকে ফলের চারার নার্সারি ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ১৮টি স্বনির্ভর দল কৃত্রিমভাবে মাশরুম চাষ করছে এবং ২৯৪টি দিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল রান্নার কাজে যুক্ত।

বিভিন্ন ছিটমহলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কমিউনিটি হল, শৌচালয়, পলিহাউস, সৌরচালিত সেচ ব্যবস্থা, ভার্মিপিট, যোগাযোগকারী রাস্তা এবং পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা সম্পন্ন হয়েছে। সেটেলমেন্ট ক্যাম্পবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য নতুন আবাস নির্মাণ কার্য দ্রুত গতিতে শেষ করার প্রক্রিয়া চলছে। তৎকালীন ছিটমহলবাসীরা এখন নব্যভারতীয়। তাদের কর্মসংস্থানের জন্য ১০০ দিনের কাজ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, স্বনির্ভর দল গঠন এবং তার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক লোন প্রদানের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে।

চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদ

২০১৭ সালের ৬ই জুন গঠিত হয় চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদ, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশানুসারে। সমগ্র মেখলিগঞ্জ মহকুমাবাসীর জন্য দিনটি ছিল ঐতিহাসিক। এমনিতেই কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জ একটি পিছিয়ে থাকা মহকুমা। এই উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে যেহেতু সমগ্র মহকুমাটিকেই আনা হয়েছে, তাই এই মহকুমার উন্নয়নের একটি অন্য দিগন্ত উন্মোচিত হয়। রাস্তাঘাট সংস্কার, পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প, নিকাশি ব্যবস্থা, পথবাতি, শ্মশান ঘাট সংস্কারের মত বেশ কিছু প্রকল্প এরই মধ্যে উন্নয়ন পর্ষদ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। অতি শীঘ্রই আরও ৪০টি প্রকল্পের কাজ উন্নয়ন পর্ষদ শুরু করতে চলেছে। যদিও এই পর্ষদের এখন শৈশবাবস্থা তবে অচিরেই এর মাধ্যমে বিপুল উন্নয়নের আশা রাখেন এলাকাবাসী।

আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান কেন্দ্র

এছাড়া উন্নয়নে গতি এনেছে নব নির্মিত এশিয়ান হাইওয়ে বা সার্ক (SAARC) রোড। চ্যাংরাবান্ধা জিরো পয়েন্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর যা অনতিবিলম্বে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন লাভ করতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে এই স্থলবন্দরটি ভারত ও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাথর, পেঁয়াজ, ভুট্টা, কাঁচালঙ্কা,

নির্মল অভিযান জনপ্রিয় করতে মেয়েদের ফুটবল প্রতিযোগিতা

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ— টোটো চালকদের নিয়ে সচেতনতা অনুষ্ঠান

গোখাদ্য, কয়লা, প্রভৃতি যেমন রপ্তানি করা হয়, তেমনই আমদানি করা হয় প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্য, তুলা ও বর্জ্য সুতি কাপড়। চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরটি ভুটান এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত সংযুক্তিকরণের মূল মাধ্যম। বহু মানুষ প্রতিদিন এই পথ দিয়েই দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত করেন। তাই এই স্থলবন্দরটির পরিকাঠামো উন্নত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় জমি সরকারের কাছে নেই। আশা রাখছি যে খুব শীঘ্রই এই সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ অভিযান

বিগত দুই বছরে মেখলিগঞ্জের অনেক সমস্যার মধ্যে যে সমস্যাটি আমার কাছে খুবই প্রকট মনে হয়েছে তা হল বাল্যবিবাহ। বহু দরিদ্র পরিবার এবং অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষ ১৮ বছর পার হওয়ার আগেই কন্যার বিবাহ সম্পাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই বাল্য বিবাহ রোধ করতে ব্লক প্রশাসন একটি বিশেষ দল গঠন করেছে। এই দলে মহিলা আধিকারিকরা ছাড়াও রয়েছেন প্রবীণ আব্দুল কাদের যিনি এই এলাকার মানুষ এবং বিডিও অফিসে কর্মরত। এছাড়াও প্রতিটি সংসদে পঞ্চায়েত সদস্য ও কমিউনিটি ফেসিলিটেটররা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই বাল্যবিবাহের খবর ব্লকের নির্দিষ্ট দলটির কাছে পৌঁছালেই হল, তৎক্ষণাৎ দলটি বেরিয়ে পড়ে। সাথে থাকে পুলিশ, কারণ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ অভিযান কোথাও কোথাও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে মানুষকে বোঝানো হয় এবং বিবাহ বন্ধের মুচলেকা নেওয়া হয়। মাঝে মাঝেই ব্লকের সব পুরোহিত ইমাম কাজি বাজনাদার নাপিত ডেকোরেটার— যারা বিয়েসাদির কাজে কোনওভাবে যুক্ত, তাদের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে একটিই বার্তা দেওয়া হয়, যে যেই পেশাতেই নিযুক্ত হউন না কেন তিনি তাঁর সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারবেন না। কাজেই এঁদের প্রত্যেকেরই জন্য কোনও বিয়ের কাজে হাত দেওয়ার আগে পাত্র ও পাত্রীর বয়স যাচাই করাটা বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে ২১টি কন্যাশ্রী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যারা বাল্যবিবাহের খবর পেলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই বিবাহ বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এভাবেই বিগত দুই বছরে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ৮৬টি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে যা যথেষ্ট সন্তোষজনক। ব্লক প্রশাসনের আরও একটি লক্ষ্য থাকে সেই একই সাথে যারা কন্যাশ্রী অনুদান পাচ্ছে না তাদের এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে এসে বাল্যবিবাহ থেকে বিরত রাখা।

শৌচালয় এক সংগ্রাম কাহিনি

এই মেখলিগঞ্জ ব্লকে বছর দুই আগে যখন বিডিও হিসাবে যোগদান করেছিলাম তখন অনেকগুলি লক্ষ্যের মধ্যে ব্লকটিকে নির্মল করার লক্ষ্যকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলাম। বহু বাড়িতেই ছিল না শৌচাগার। অগত্যা মাঠ, ঘাট, নদী ও পুকুরের ধার ছিল শৌচকর্মের প্রধান যায়গা। কোচবিহারের জেলাশাসকের প্রেরণায় ও সমর্থনে নেমে পড়লাম এক অসাধ্য সাধনে। সুচনা করা হল কমিউনিটি লেড টোটাল স্যানিটেশন প্রকল্পের। এই প্রকল্পের শর্ত হল নিজের শৌচাগার নিজের অর্থ ও শ্রম দ্বারা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি সংসদে নিযুক্ত হল একজন করে কমিউনিটি ফেসিলিটেটর। কাকভোরে উঠে ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল আধিকারিক ও কর্মচারীদের নিয়ে মাঠে ঘাটে হানা দিতে শুরু করলাম। তৈরি করা হল প্রমিলা বাহিনী এবং শিশুদের নিয়ে বাঁশিসেনা বাহিনী। উন্মুক্ত জায়গায় কাউকে শৌচকর্ম করতে দেখলেই বাঁশিসেনার শিশুরা বাঁশি বাজিয়ে সাবধান করে দিত। এবং প্রমিলা বাহিনী লাঠি নিয়ে তেড়ে যেত। বিভিন্ন নাটক, যাত্রাপালা, পুতুলনাচ, পথনাটিকা, ভাওয়াইয়া গান এবং ভোর কীর্তনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শুরু হল প্রচার। প্রতিটি হাসপাতালে ডাক্তারদের দেওয়া প্রেসক্রিপশানে 'একটি স্বাস্থসম্মত শৌচাগার বানান ও ব্যবহার করুন'। এই লেখাটি বাধ্যতামুলক করা হল। প্রতিটি বিদ্যালয়ে হত নির্মল রোল কল। অর্থাৎ রোলকলের সময় শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন যে ছাত্রটির বাড়িতে শৌচাগার আছে কি না। যদি না থাকে অবিলম্বে মা-বাবাকে বলতে একটি শৌচাগার নির্মাণ করতে ও ব্যবহার করতে। বিভিন্ন সংসদে ট্রেনিং প্রাপ্ত কমিউনিটি ফেসিলিটেটররা যেত ট্রিগারিং করতে অর্থাৎ উন্মুক্ত জায়গায় শৌচকর্ম করলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রত্যক্ষভাবে কী রূপ ক্ষতি সাধন হয়, তা দেখান হত। সমগ্র ব্লকের ১১২০ জন মহিলাকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল যারা বিনা পারিশ্রমিকে স্বতস্ফূর্তভাবে এই সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। যে সকল স্বনির্ভর দলের মহিলাদের বাড়িতে শৌচাগার ছিল না তাদের সকল অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হল। এমনকি মিড-ডে-মিলের রান্নার কাজে নিযুক্ত মহিলারাও ছাড় পেলেন না। গ্রাম পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে যারা বিভিন্ন শংসাপত্র নিতে আসতেন, তাদের বাড়িতে শৌচাগার না থাকলে শংসাপত্র মিলত না। শৌচাগার না থাকলে ১০০ দিনের কাজ প্রদান করা বন্ধ করে দেওয়া হল। চারিদিক থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চাপ সহ্য করে প্রশাসন অনড় থাকাতে চতুর্দিকে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গেল। সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে নিজের শৌচাগার নিজেই বানানো ছাড়া মানুষের কাছে আর কোনও বিকল্প রইল না। মাত্র সাত মাসেই এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হল ১৭৫৩৪টি শৌচাগার সি এল টি এস পদ্ধতিতে নির্মাণ যা নিঃসন্দেহে একটি বড় নজির হয়ে থাকবে এই ব্লকের মানুষের কাছে। কেবল সরকারিস্তরে নির্মল আখ্যাই নয়, আজ তার একবছর পরেই মানুষ দেখছে এই নির্মল মেখলিগঞ্জে ডাইরিয়া এবং বিভিন্ন জলবাহিত রোগ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে তাঁর শৌচাগারটি হল তাঁর পরিবারের হাসপাতাল।

প্রশাসনিক পদে থাকার সুবাদে সবথেকে বড় উপলব্ধি, মানুষের সাথে আপনজনের মত মিশে তাদের প্রকৃত আধিকারিক হতে হবে। তাদের বন্ধু অভিভাবক দুইই হতে হবে, বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সবসময় হয়ত সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও ধৈর্য্য ধরে মানুষের কথা শুনলে সেই সমস্যার অর্ধেক সমাধান হয়েই যায়। একজন বিডিও-র কাছে মানুষের প্রত্যাশা প্রচুর। যতই পরিষেবা দেওয়া যাক না কেন তা সবসময় সামান্যই মনে হয়। কিন্তু তাও দেখি আমার প্রচেষ্টার যেন কোনও খামতি না থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস— 'বড়ই দরদি অফিসার' হচ্ছে বিডিও শব্দটি প্রকৃত ভাবার্থ।

বিরূপাক্ষ মিত্র

সুটুঙ্গা নদীতে সূর্যাস্ত ও ডাক্তারবাবুর আশ্রম

সেদিন যাওয়ার কথা ছিল হেমন্থ বিএসএফ ক্যাম্পে, আর একবার ভারত বাংলাদেশের মাঝখানে বয়ে চলা নদীতে সূর্যাস্ত দেখতে। আগেরবার গিয়ে ওঁদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম। যথারীতি আজ দেরি হয়ে গেল তেনার মিটিং শেষ হতে হতে। তাই চলে গেলাম জামালদা সৎসঙ্গ আশ্রম এবং লাগোয়া সুটুঙ্গা নদীতেসানসেট দেখতে। ঠিক আশ্রমের পেছন দিয়ে বয়ে চলেছে এই নদী।

বলাই বাহুল্য একদম নিরাশ হইনি। কত রং ছিল আকাশ জুড়ে! আশ্রমের পেছনের জঙ্গলে রয়েছে আশ্রম কর্তৃপক্ষের যত্নে লালিত পালিত অনেক হরিণ। তারা মানুষ দেখলে ভয় পায় না, উল্টে কাছে চলে আসে। যদিও তাদের খাবার দেওয়া মানা, তবুও কিছু লোক তা করায় বেশ একটা ধমকে দিয়েছিলাম। ওরা আদর পাওয়ার জন্য জ্বালের ভেতরে একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে কাছে আসতে চায়। অদ্ভুত সুন্দর সে দৃশ্য।

উপরি পাওনা আশ্রমের কর্ণধার ডাক্তারবাবু আর তার স্ত্রীর আতিথেয়তা, সঙ্গে লনের ছাউনিতে আবছা আলোয় বসে মুড়ি মাখা, নারকেল কুচি আর শশা। ছিল আমার প্রিয় নারকেলের ব্রাউন নাড়ুও। ওঁদের সঙ্গে গল্প করলে মন ভাল হয়। ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের বাইরে থেকে কিছু মানুষ নীরবে মানুষের সেবা করছেন, করে চলেছেন। কতবার যে ওঁরা উৎসবের সময় বা এমনি সময়ে আবার আসবার কথা বললেন!

এই ডাক্তারবাবু আসলে ত্রিপুরার মানুষ। আরজিকর মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে তার প্রথম পোস্টিং হয় জামালদা হাসপাতালে। সেটা ১৯৭৬ সালের ৪ ডিসেম্বর, যখন তিনি প্রথম কাজে যোগ দিতে আসেন। তারপর কীভাবে এই আশ্রম গড়ে উঠেছে তা ওঁর মুখ থেকেই শুনেছিলাম।

—"আমার চাকরির তিন মাসের মাথায় আমাদের সৎসঙ্গ আশ্রমের আচার্যদেব পুজ্যপাদ দাদা গৌহাটি থেকে ফেরার পথে জামালদা আসেন। তখন মাথাভাঙা ব্রিজটা ছিল না, উনি ময়নাগুড়ি ঘুরে আসেন। এখানে সাড়ে চার একর জমি আছে ঠাকুরের, উনি বললেন, 'চল, দেখে আসি'। বললাম সে তো শুধু জঙ্গল, কুল গাছ, কলা গাছ এইসবে ভরতি। উনি আবার বললেন, 'করার ইচ্ছে হলে দোতলা ভিত করে করবে।' অদ্ভুতভাবে পরদিনই কাজ শুরু হয়ে গেল। এর তিন মাসের মাথায় শ্রী শ্রী বড়দা ২০০ জন লোক নিয়ে এলেন, আমার কোয়ার্টারে রাত্রিবাস করলেন তিনি। ততদিনে মূল মন্দিরের ভিত থেকে জানলার লেবেল অবধি কাজ হয়েছে। পরদিন বড়দা রাঙা মা-কে বলছেন, 'দেখ ছেলেটা কী সুন্দর করেছে'। বললেন, 'তাড়াতাড়ি সব করে ফ্যাল'।

কোনও প্ল্যান নেই কিচ্ছু নেই, সরকারি অনুদান নেই। স্কুল কলেজ গড়তেও টাকার দরকার হয়। আসলে খোদ পরম পিতা যখন ইচ্ছে করেন তখন ঠিক কোনওভাবে করিয়ে নেন। তিনি মানুষ চিনে ফেলেন।"

ডাক্তারবাবু সারারাত ভাবতেন কীভাবে সব হবে, তিনি শুধু ইট সিমেন্টের জন্য প্রার্থনা করতেন। এরপর রোজই কেউ না কেউ আসত এবং ডাক্তার দত্ত তার সঙ্গে গল্প করতেন। গল্পচ্ছলে উঠে আসত এই প্রসঙ্গ। আর কেমন করে যেন আগন্তুক নিজেই উৎসাহী হয়ে আরও লোকজন এনে কাজের গতি বাড়িয়ে দিত। কখনও কুড়ি কুইন্টাল সিমেন্ট, কখনও পাথর, বালি— এসবই যোগাড় হয়ে গেছে আপনাআপনিই। দু' বছরেই কাজ শেষ, আর এই কাজের জন্য উনি কারও কাছে একটা টাকাও চাননি, কোনও চিঠিও কাউকে দেন নি টাকা চেয়ে।

অদ্ভুত মনে হলেও সত্যি। আর অবশেষে ১৯৮০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা পায় জামালদা সৎসঙ্গ আশ্রম।

ডাক্তারবাবুর মুখে এক প্রশান্তির হাসি দেখা যায়। আমরা শুনে চলি তার কথা। এখনও ওই দিনটাতেই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। উত্তরবঙ্গসহ আসাম, কলকাতা থেকে প্রচুর মানুষ আসেন এই উৎসবে যোগ দিতে। দূরের মানুষদের থাকার ব্যবস্থাও এখানেই হয়।

ডাক্তারবাবু সকাল দশটা থেকে একটা পর্যন্ত রুগি দেখেন। তারপরেও রুগি এলে তাকে ফেরান না, সম্পূর্ণ সেবার মানসিকতা নিয়েই তিনি ডাক্তারি করেন, এখনও।

প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এই আশ্রমে। ভক্ত না হয়েও এমনি ঘুরে আসা যায় এখানে, অদ্ভুত প্রশান্তি আসে একটা। চুপচাপ শান্ত পরিবেশে এক অনাবিল আনন্দ আছে। ঝকঝকে আশ্রম প্রাঙ্গণ, ফুল গাছ, ফল গাছের সমারোহ, আছে বাচ্চাদের পার্ক, রয়েছে পাঁচিলের গায়ে গায়ে হিতোপদেশের গল্প আঁকা, ছোটরা পড়তে পারে এমন। সব মিলিয়ে একটা দিন মন ভাল করতে চাইলে যেতেই হবে।

আর দুপুরে খেতে চাইলে একটু জানিয়ে রাখলে তাঁরাই ব্যবস্থা করবেন। আমরা মাটিতে পিঁড়ি পেতে খেয়েছি অমৃত। গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতে মুগ ডাল, বেগুন ভাজা, নিরামিশ তরকারি আর পনির ফুলকপি। এইসব সব্জি কিন্তু আশ্রমেরই ক্ষেতে সযত্নে নিজেদের চাষ করা। তাতে নেই কোনও পেস্টিসাইডস।

সব মিলিয়ে একটি বিশুদ্ধ দিন কাটানো যায় জামালদহের এই আশ্রমে।

হিমি মিত্র রায়

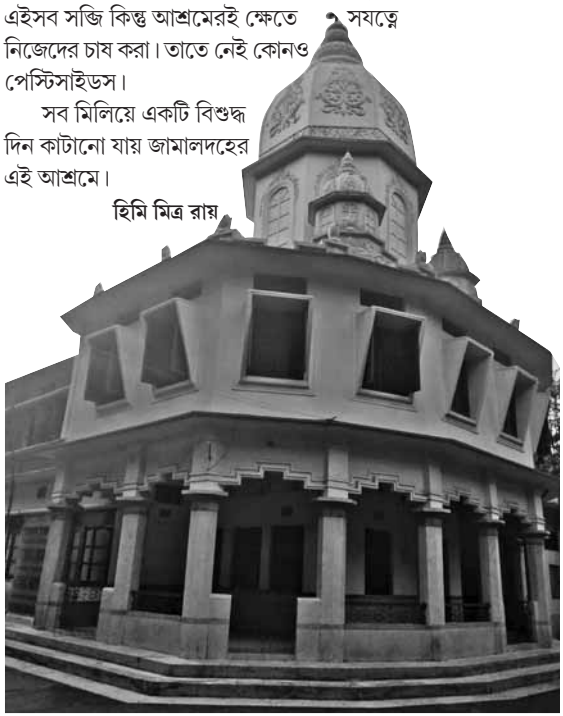

রূপকথার সেই কিশোর বেলা হাতড়ে বেড়ায় যে মেখলিগঞ্জ

আজও যে নামটি শুনলেই ফিরে চলে যাই বর্ষার সেই ঘনঘোর সন্ধ্যা-রাতে। আমরা সাত আট জন মামাতো-মাসতুতো ভাইবোন বিছানার ওপরে ঘন হয়ে বসে আছি, কাঠের খুঁটি দিয়ে উঁচু করা কাঠের মেঝের ঘরের এক কোণে কমিয়ে রাখা লণ্ঠনের আলো, আর করোগেটেড টিনের দেওয়ালে সেই আলো-আঁধারিতে তখন বিচিত্র ছায়াবাজি। টিনের চালে নিরবিচ্ছিন্ন, অবিশ্রান্ত, অবিরাম বৃষ্টির শব্দ। একটানা সে শব্দের মধ্যেও মিশে থাকে ছোটখাট বৈচিত্র্য, কখনো পাগল হাওয়া বৃষ্টির ফোঁটাকে টিনের চালে পড়ার আগেই টেনে নিয়ে যায় কোন সুদূরে। আবার কখনো বৃষ্টি তেপান্তরের মাঠ পেরনো দূরন্ত ঘোড়সওয়ার। কখনও বৃষ্টি পতনের শব্দকে চমকে দিয়ে টিনের ওপর ঝরে পড়ে সুপুরি গাছের অনেক দিন ধরে ঝুলে থাকা শুকনো ডাল।

আর সেই বিচিত্র বৃষ্টি পতনের শব্দ ভেদ করে বাবা শোনাচ্ছেন তাঁর প্রথম চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা।

উত্তরবঙ্গের কোনও এক নদীর ঘাট থেকে অনেক দূরে ছিল বাবার স্কুল। কাজে যোগ দেওয়ার পর প্রথম গরমের ছুটি শেষে স্কুল যে দিন খুলবে তার আগের দিন বাবার কাছে প্রায় অচেনা। দূর্যোগের সেই সন্ধ্যায় মুশকিল আসান হয়ে লণ্ঠন ও ছাতাসহ হঠাৎ আবির্ভূত হলেন বাবার হস্টেলের অসম বয়সী রুমমেট মৌলবী সাহেব। নিরাপদে হস্টেলের গেটে পৌঁছে মৌলবী সাহেব 'তুমি ঢোকো আমি আসছি' বলে পাশের আবছায়ায় মিশে গেলেন। ঘরে ঢুকে বাবা দেখেন মৌলবী সাহেবের বিছানা নেই, তক্তপোস ফাঁকা। পাশের ঘরের মাস্টারমশাইদের জিজ্ঞেস করতেই তাঁরা জানালেন, গরমের ছুটি চলাকলীন হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা গেছেন মৌলবী সাহেব।

সেই অবিরাম বৃষ্টির রাতে এই সামান্য ভূতের গল্প আমাদের চেতনাকে প্রায় অবশ করে দিত। ঠিক তখনই কাঠের উঁচু করা মেঝের নিচে ঢুকে আসা ভাম বিড়ালের গায়ের আতপ চালের মত গন্ধে ভরে যেত ঘর। মামাতো ছোট বোনটা গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে গেছে ততক্ষণে। আমারও চোখে জড়িয়ে আসছে মায়াবী স্বপ্নের ঘোর। এ আমার শিশু-কিশোর বেলার অতি প্রিয় মামার বাড়ি মেখলিগঞ্জের স্মৃতি।

সে সময় মেখলিগঞ্জের সেই কাঠের মেঝে, টিনের চাল আর দেওয়ালের ঘর আমার মত আমাদের মামাতো মাসতুতো সব ভাইবোনকে সারাবছর ধরে অদৃশ্য চুম্বকের মত টানতো। গরমের ছুটিতে সবাই এসে হাজির হতাম। আম, কাঁঠাল, জাম গাছের সাথে পাশের বাগানে ছিল অসংখ্য সুপুরি গাছ। আর ছিল ফুলঝাড়ু আর তেজপাতা গাছ। পিছন দিকে ছিল আনারসের বাগান। সেখানে অবশ্য আমাদের ছোটদের ঢোকা বারণ ছিল সাপের ভয়ে। গরমের ছুটি হলে কী হয় উত্তরবঙ্গের বৃষ্টি আসতো দক্ষিণবঙ্গের অনেক আগে। গরমের ছুটিকে তাই মনে হত বর্ষার ছুটি। তবে সকালবেলা কোনও কোনও দিন চারিদিক ভরে যেত অসম্ভব সুন্দর

সে সময় মেখলিগঞ্জের সেই কাঠের মেঝে, টিনের চাল আর দেওয়ালের ঘর আমার মত আমাদের মামাতো মাসতুতো সব ভাইবোনকে সারাবছর ধরে অদৃশ্য চুম্বকের মত টানতো। গরমের ছুটিতে সবাই এসে হাজির হতাম। আম, কাঁঠাল, জাম গাছের সাথে পাশের বাগানে ছিল অসংখ্য সুপুরি গাছ। আর ছিল ফুলঝাড়ু আর তেজপাতা গাছ। পিছন দিকে ছিল আনারসের বাগান। সেখানে অবশ্য আমাদের ছোটদের ঢোকা বারণ ছিল সাপের ভয়ে। গরমের ছুটি হলে কী হয় উত্তরবঙ্গের বৃষ্টি আসতো দক্ষিণবঙ্গের অনেক আগে। গরমের ছুটিকে তাই মনে হত বর্ষার ছুটি।

বাবা স্কুল হস্টেলে ফিরবেন বলে নামলেন খেয়া ঘাটে। সেই সন্ধ্যাও ছিল অবিশ্রান্ত বর্ষণের। খেয়াঘাট থেকে হস্টেলের গ্রামীণ রাস্তা প্রায় দু' কিলোমিটারের এবং

মায়াবী রোদ্দুরে। সারারাতের বৃষ্টিভেজা সবুজ গাছপালায় সে রোদ্দুর হেসে বেড়াতো, খেলে বেড়াত আদুরে মেয়ের মত। মাসের হিসাবে গ্রীষ্মকাল হলেও কাঠের বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে শিরশির করে উঠতো গা। রাতের বৃষ্টির জল রাস্তার পাশের নালা দিয়ে বয়ে যেত। স্বচ্ছ জলের নিচে রং বেরঙের নুড়ি পাথরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম অসীম বিস্ময়ে।

মাঝে মাঝে হানা দিতাম স্বাধীনতা সংগ্রামী দাদুর পরিত্যক্ত তালা দেওয়া ঘরে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা পুরনো জিনিসের সোঁদা গন্ধ টানতো অদৃশ্য বন্ধনে। দাদুর কাঠের ফ্রেম দেওয়া কাচের আলমারির সবকটা কাচই ভাঙা ছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সে আলমারিতে একটা বড়সড়ো তালা দেওয়া থাকতো। হয়তো বা তার চাবিই হারিয়ে গিয়েছিল। ভাঙা কাচের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনতাম সব 'অমূল্য' সম্পদ। কখনও দাদুর একদিকের ডান্ডিভাঙা গোল ফ্রেমের চশমা, কখনও আদ্যিকালের হিসাবের খাতা, 'রাজসিংহ'-এর প্রথম সংস্করণ, আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জীর্ণ বই; পাতা ওল্টাতে গেলেই পাতা যেত ভেঙে। ওই ঘরেই প্রথম দেখি চরকা। গান্ধীজীর ভাবশিষ্য দাদু নিয়মিত চরকায় সুতো কাটতেন। মায়ের মুখে শুনেছি দাদুর একটি আলাদা তাঁতঘরও ছিল। আমরা অবশ্য তার কেবল ধ্বংসস্তূপই দেখেছি।

বিকেলবেলা আমরা এক একদিন যেতাম তিস্তার ধারে। নদীর ছোট ছোট মাছ ধরে জাল আর খালুই কাঁধে নিয়ে বালির চর থেকে শনের জঙ্গল ভেঙে উঠে আসতেন স্থানীয় জেলেরা, কপাল ভাল থাকলে তাদের কাছে মিলে যেত সুস্বাদু সব ছোট ছোট মাছ। বালির চর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সূর্য যখন দিগন্তে তখন ফেরার পথ ধরতাম। কোনও দিন সামনে এসে পড়ত বাচ্চা-কাচ্চাসহ শেয়াল পরিবার। পাশে থাকা মামা বা মেসোনের হাত চেপে ধরতাম আধো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করা শেয়ালের চোখের দিকে তাকিয়ে। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম এরাই কি উপেন্দ্রকিশোরের সেই চালাক শিয়াল আর শিয়ালনী!

ছোট মামা কাজ করতেন রেলে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ছোট বড় নানা স্টেশনে বহুদিন কাটিয়েছিলেন। তাঁর ছিল বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে ছোট মামার কাছে শুনেছিলাম উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সেই উপজাতিদের কথা কুকুরকে চাল খাইয়ে সেই কুকুর পুড়িয়ে যারা খায়। শুনতাম মালগাড়ির গার্ডের ডাকাতের চোখে ধুলো দিয়ে মালগাড়ি বাঁচিয়ে নিয়ে গৌহাটি ফিরে আসার রোমহর্ষক বর্ণনা।

মেখলিগঞ্জ মানে আমার কাছে ছেলেবেলার বহু সুখস্মৃতির ভিড়। মেজ মামীনসোনা যখন মাটির মেঝের রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে খেতে ডাকতো তখন প্রথম ব্যাচে আমরা আট ভাইবোন গোল হয়ে খেতে বসতাম। কাঁসার থালা, গ্লাস, বাটিতে বেড়ে দেওয়া সে খাওয়ারের স্বাদ আজও জমে আছে মনের মণিকোঠায়। মামার বাড়ির সামনেই ছিল ইন্দিরা বালিকা বিদ্যালয়, যে স্কুলে মা এক সময় প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন, সে স্কুলের মাঠে বিকেলে যেতাম খেলতে। ঘাসের নিচে জমে থাকা জল আর চোরকাঁটা লেগে যেত পায়ে, প্যান্টে।

কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে আমার সেই প্রিয় মামার বাড়ি। সেইসাথে চিরকালের মত হারিয়ে গেছে আমাদের সোনালি শৈশব। নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন থেকে বাস ছাড়ার পর নাকে এসে লাগতো অদ্ভুত এক গন্ধ। তখন ভাবতাম সে গন্ধ তামাক পাতার বা পাট পচার বা পাকা সুপুরির। এখন বুঝি সে গন্ধ আমার সেই ছেলেবেলার, আজও বুকের মাঝে জেগে আছে সেই সুগন্ধ, যা আসলে আমার হারিয়ে যাওয়া প্রিয় শৈশবের, আমার প্রিয় মেখলিগঞ্জের।

জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের নাম মনে রেখেছে কি মেখলিগঞ্জ?

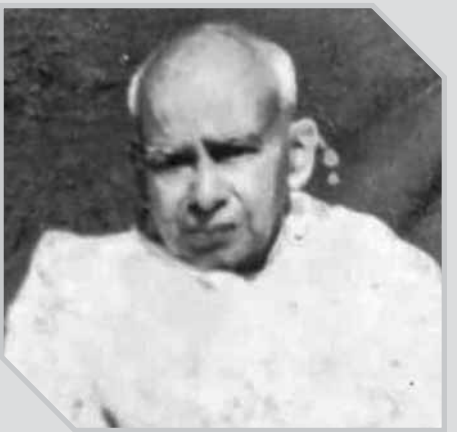

আমার জন্ম হয়েছিল যে মেখলিগঞ্জে, সেখানেই কেটেছে আমার ছেলেবেলা, কর্মজীবনও শুরু করেছিলাম সেই মেখলিগঞ্জেই। বছর পঞ্চাশ হতে চলল বিবাহসূত্রে ছেড়ে আসতে হয়েছে আমার প্রিয় বাপের বাড়ি। আমাদের সেই পাঁচ বোন তিন ভাইয়ে মিলে জমজমাট থাকত যে বাড়ি তা সেই কতদিন হল হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, শুধু স্মৃতি হয়ে মেখলিগঞ্জ জেগে আছে মনের মণিকোঠায়। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় ওপার থেকে প্রচুর মানুষ মেখলিগঞ্জে বসবাসের জন্য চলে আসেন। মনে পড়ে সেই সময়ে রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছিলেন মেখলিগঞ্জে। মহারাণী ইন্দিরা দেবীর নামে যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল আমি একসময় তার প্রধান শিক্ষিকা ছিলাম। আজ আশির দোরগোড়ায় পৌঁছে নানা স্মৃতির মাঝে যাঁর কথা এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করতে ইচ্ছা করছে তিনি আমার বাবা, বঙ্কিমচন্দ্র রায়।

তৎকালীন কোচবিহারের মহারাজা সাতটি জেলার পত্তন করেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা এই মেখলিগঞ্জ। মেখলি নামে এক ধরনের চট থেকেই মেখলিগঞ্জ নামের উৎপত্তি। সেকালে প্রচুর পাট চাষ হত মেখলিগঞ্জের আশপাশে। সেই পাটগাছ থেকে সুতো তৈরি করে বড় বড় আকারে মেখলি নামে চট তৈরি হত। কোচবিহারের মহারাজা প্রতিটি জেলায় তৈরি করে দিয়েছিলেন হাইস্কুল এবং হস্টেল। বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহারাজার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন। বাবা ছিলেন কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজের কৃতি ছাত্র। সেসময় ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রবাদ প্রতিম পণ্ডিত আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (যাঁর নামে আজকের এবিএন শীল কলেজ)। কোচবিহারের মহারাজের খেলাধূলায় খুব উৎসাহ ছিল। একবার বাবার দেওয়া গোলে মহারাজের দল বিজয়ী হওয়ায় স্বয়ং ব্রজেন শীল বাবার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। বাবার প্রধান শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের দিন মেখলিগঞ্জে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের শেষ রাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ। মেখলিগঞ্জের শিক্ষা-সংস্কৃতি জগৎ একটা সময় বাবাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। গান্ধীবাদী বাবা নিয়মিত চরকা কাটতেন। তাঁর নিজের একটি তাঁত ঘরও ছিল। বাবার হাতে তৈরি চাদর শীতের সময় আমরা ব্যবহারও করেছি।

আশি বছর বয়সে বাবা প্রয়াত হন। তখনকার দিনে আনন্দবাজার পত্রিকায় গুরুত্বসহকারে বাবার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বছর কয়েক আগে সংবাদ পেয়েছিলাম যে মেখলিগঞ্জে একটি সুপার মার্কেটের নামকরণ করা হয়েছিল বাবার নামে। সম্প্রতি সে নাম পাল্টে নাকি অন্য নাম রাখা হয়েছে শুনেছি। তা সে কোথাও বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের নাম থাকুক বা না থাকুক, আমি নিশ্চিত যে মেখলিগঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে তাঁর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মেখলিগঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার সূচনাকালে তাঁর অবদান অস্বীকার করা যাবে না কোনও যুক্তিতেই। প্রকৃতপক্ষেই তাঁর উল্লেখ ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মেখলিগঞ্জের ইতিহাসও।

দীপালি রায় (লাহিড়ী)

হুজুরের হলদিবাড়ি

একজনকে ছোটবেলায় চিনতাম যিনি সপ্তাহে একদিন তিন-চারটে বড় ব্যাগ নিয়ে দশটার ট্রেনে জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি গিয়ে সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে ফিরে আসতেন। ব্যাগগুলো তখন হরেক শাক-সব্জিতে ভর্তি। তাঁর কাছেই জেনেছিলাম, বাজার করতে হলে হলদিবাড়ি যেতে হয়। কে জানি বুঝিয়েছিল যে হলদিবাড়ি স্টেশানে ট্রেন ঢোকার আগে লাইনের দু-পাশে এক কিলোমিটার জুড়ে নাকি বাজার দেখা যাবে। মনে হবে যে ট্রেনটা একটা বাজারের মধ্যে দিয়ে স্টেশানে এসে থামল। বাচ্চাবেলায় এ গপ্পো বিশ্বাস করেছিলাম অন্তর দিয়ে।

এরপর যখন বালকদশা কাটল। একটু ল্যাজ আর পাখা গজাল তখন আবিষ্কার করলাম, ইচ্ছে করলেই ট্রেনে উঠে হলদিবাড়ি চলে যাওয়া যায় এবং সেখানে ট্রেন থেমে নেমে একটু অপেক্ষা করলেই ফিরতি ট্রেন। সবচে' ভালো হয় তিনটের ট্রেনে উঠে সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে ফিরে আসা। টিকিট কাটার কোনও প্রশ্নই নেই। চেনা-জানা অনেকেকেই পাওয়া গেল যারা সময় পেলে হলদিবাড়ি থেকে মুফতে ঘুরে আসে।

তা সত্ত্বেও হলদিবাড়ি যেতে যেতে স্কুলবেলা ফুরিয়ে গেল প্রায়। শেষে একদিন সত্যি সত্যিই এসে নামলাম হলদিবাড়ি স্টেশানে। নিশ্চিত হলাম যে বাজারের মধ্যে দিয়ে ট্রেন যাওয়ার ব্যাপারটা সেন্ট পার্সেন্ট ঢপ।

দেশভাগের কারণে জলপাইগুড়ি যতটা চোখে সর্ষেফুল দেখেছে, হলদিবাড়ি তার তুলনায়

অনেক বেশি দেখেছে। এই শহর জলপাইগুড়ি থেকে সড়ক পথে বাইশ কিলোমিটার দূরে, কিন্তু জেলা সদরের কাছে থাকার সুবিধে এর নেই। কারণ শহরটা কোচবিহার জেলার। হলদিবাড়ি থেকে কোচবিহার যাওয়া মানে রীতিমত আয়োজন। অনেক পথ বেশি ঘুরে, মানে ঘুরপথে জেলা শহরে যেতে হয় তিস্তার কারণে। সেটা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে বাঙলাদেশে ঢুকেছে, কিন্তু তাকে পার করার মত সেতু নেই। তাই নদীর ওপাড়ে থাকা মেখলিগঞ্জে পৌঁছোতে বাড়তি পথ পেরুতে হয় কমবেশি সাতচল্লিশ কিলোমিটার।

এই অবস্থায় হলদিবাড়ির উচিত ছিল জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে জুড়ে যাওয়া। হলদিবাড়ির মানুষ সেটাই চায়। কিন্তু কোচবিহার রাজার সঙ্গে নাকি এমন চুক্তি দেশের হয়েছিল যার ফলে সেই জেলাকে ভাঙা যাবে না। অবশ্যি ভবিষ্যতে হলদিবাড়ির মানুষের জন্য সুখবর তৈরি হচ্ছে। তিস্তার ওপর সেতু বানান হচ্ছে। হলদিবাড়ির রাজনীতিতে সেই সেতু একটি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনৈতিক দলগুলি সবাই এ ব্যাপারে একমত যে সেতুটা তাঁদের জন্যই হচ্ছে।

হলদিবাড়ি পার হলেই বাংলাদেশ। সে দেশ থেকে আসা বিদেশি জিনিসপত্র একদা হলদিবাড়ি বাজার আলো করে থাকত। অস্ট্রেলিয়ার বেবি ফুড, সুইডেনের চকোলেট, ক্যাসিও কোম্পানির ডিজিটাল ঘড়ি, ফ্লাইং মেশিনের প্যান্ট ইত্যাদির পাশাপাশি বিখ্যাত 'কেয়া' সাবান কিনতে হলদিবাড়ি ছুটত অনেকে। অবশ্যি খবর পাঠিয়ে দিলে টাউনে এসে হোম ডেলিভারিও করার ব্যবস্থাও ছিল। স্থানীয় দোকানদারেরা কেউ কেউ রাখতেন, তবে লুকিয়ে। হাজার হলেও বিদেশি জিনিস তখন দেশে বাড়ন্ত। বেচাও নিষেধ। কিন্তু হলদিবাড়িতে সে নিয়ম দেখতে যাবে কে? সেখানকার লোক পাশের পাড়ায় যাওয়ার মত বাঙলাদেশে চলে যায়।

তবে এসব পুরনো কথা। সে ছিল নন-ডিজিটাল যুগ। হলদিবাড়ি এখন সে রকম নেই।

হলদিবাড়ি স্টেশানে ট্রেন থেকে নেমেছি। রেল লাইন এই ছোট্ট শহরটাকে পুব-পশ্চিমে ভাগ করে ফেলেছে। বিখ্যাত পাইকারি সব্জি বাজার সমেত বাজার এলাকাটা পুবে। কারণ তিস্তা নদীটা সেদিকেই। পোস্টাপিস, পুরসভা, খেলার মাঠ, মেলার মাঠ, স্কুল, কলেজ— এসব পশ্চিমে। ছোটবেলায় একটা স্টেট বাসের সামনে লেখা দেখতাম 'হেমকুমারী ভায়া হলদিবাড়ি'। হেমকুমারী নামটা বেশ রোমান্টিক লেগেছিল। বাস্তবে অবশ্যি রোমান্টিক মনে হয় নি। সীমান্ত লাগোয়া একটা নিরীহ গ্রাম।

মজার ব্যাপার হলো হলদিবাড়িতে আরো দুটো হলদিবাড়ি আছে। এদের নাম উত্তর আর দক্ষিণ ছোট হলদিবাড়ি। এরা অবশ্য হলদিবাড়ি পুর এলাকার বাইরে।

স্টেশান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। ভ্যাপসা গরম, তবে রোদ্দুরে একটা ছায়া ছায়া ভাব। হলদিবাড়ির শাক-সব্জির অগাধ সুখ্যাতি শুনলেও আমি সেখানে গেলে একটা জিনিসই বাজার করি। প্যাকেট কয়েক বিড়ি। স্টেশান রোড ধরে একটু হাঁটার পর বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে বাবুপাড়ার রাস্তায় উঠে মনে হল কোথাও বসে অপ্রকাশ্যে একটা বিড়িপান করি। রাস্তা ছাড়া বাবুপাড়ার খুব একটা কিছু বদলেছে বলে মনে হল না। এমনিতে হলদিবাড়ি বেশ গাছপালায় ঢাকা চমৎকার শহর। ইংরেজ আমলে সরকারি চাকরি নিয়ে আসা বাবুরা সবাই মিলে একটা বাবুপাড়া বানিয়ে ফেলত। চায়ের দোকানে সন্ধানে হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারলাম যে বাবুরা উদ্যোগ নিয়ে তাঁদের পাড়াতেই হাইস্কুল, পার্ক, হসপিটাল বানিয়ে ফেলেছিলেন। বিডিওবাবুর আপিসও সে পাড়ার কাছাকাছি। আরেকটু এগিয়ে গেলে মেলার মাঠ। বিডিও আপিস লাগোয়া একটা থাকার জায়গাও হয়েছে সরকারি উদ্যোগে। সেখানে ঘরগুলোর নাম ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীর নামে। বছর কয়েক আগে একবার সারাদিন হলদিবাড়ি কাটিয়ে রাতে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

যদি দু-একদিন স্রেফ শুয়ে-বসে অলস জীবন কাটাতে চান তাহলে বিডিও আপিসে যোগাযোগ করে সেই অতিথিশালায় থাকতে পারেন। রাস্তাঘাট আগের চাইতে উন্নত হয়েছে, ঘরবাড়িও বেড়েছে অনেক, তবুও হলদিবাড়ি শহরে কোথাও যেন সময় একটু থমকে থাকে। এর কারণ বোধহয় আধুনিক গতিময় জীবন এখানে অনুপস্থিত। যদি কোনও অনুপ্রেরণার কারণে কেউ শহরের এলোমেলো ভাবটা দূর করে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে পারে তবে হলদিবাড়ির চেহারা বদলে যাবে। এই শহরটা যেন সেই মেয়ে যে ভারি সুন্দর কিন্তু খারাপ ভাবে সেজে থাকে।

অতিথিশালার কাছাকাছি চা পাওয়া গেল। পর পর দু-তিনটে দোকান। বাইরের লোক হলদিবাড়িতে তেমন আসে না বলেই হয় তো তেমন রেস্টোরান্ট কি হোটেল হয় নি। তবে ফেরার সময় বাস রাস্তা ধরেছিলাম। কলেজ পেরিয়ে হলদিবাড়ি রোড ধরে কিঞ্চিৎ জলপাইগুড়ির দিকে এগোতে চোখে পড়ল একটা রেস্টোরান্ট।

লেখার শুরুর দিকে বলেছিলাম যে হলদিবাড়ির মানুষের জন্য সুখবর তৈরি হচ্ছে কারণ তিস্তার ওপর দিয়ে নির্মিত হচ্ছে সেতু। ভবিষ্যতে কোচবিহার থেকে মাথাভাঙ্গা চ্যাংড়াবান্ধা হয়ে মেখলিগঞ্জ ছুঁয়ে সেতু পেরিয়ে হলদিবাড়ির পৌঁছনো যেমন সোজা হবে, তেমনই আবার হলদিবাড়ি থেকে গড়ালবাড়ি-সুকানি-ফাটাপুকুর-আমবাড়ি হয়ে চলে যাওয়া যাবে শিলিগুড়ি। চ্যাংড়াবান্ধা আর ফুলবাড়ি সীমান্তের যোগাযোগ সহজ হবে অনেক। বলা বাহুল্য যে সেদিন হলদিবাড়ি অনেক বদলে যাবে।

সুখবর আরও একটা ভবিষ্যতে আশা করতে পারে হলদিবাড়ি। তা হল বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে রেল যোগাযোগ।

এসব ভাবতে ভাবতে কাপ দুয়েক চা আর একজোড়া বিড়ি উড়ে গেল। বেশ একটু উত্তেজিত বোধ করলাম। পাশে হালকা নীল ফতুয়া পরা মধ্য বয়সের একজনের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলছিলাম। তাঁকেও মনে হল বেশ উত্তেজিত। তিনি আমার চাইতে দ্বিগুণ স্পিডে কয়েকটা বিড়ি শেষ করে বললেন, 'জমির দাম বাড়তেসে। আমার কাসে ভালো জমি আসে। নিবেন নাকি?'

জমির ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি আবার হাঁটা দিলাম। এ রাস্তা সে রাস্তা দিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করে একটা রাস্তায় পা দিয়ে মনে হল এটা মাজার শরিফের দিকে গেছে। পথ দুটো কালী মন্দির। যে কারণে হলদিবাড়ির নাম অনেকে জানেন সেটা হল হুজুর সাহেবের মেলা। সে মেলা এক হলুস্থুলু ব্যাপার বটে। মেলার দিন হলদিবাড়িগামী ট্রেনের ছাদে চেপে লোক মাজার শরিফে যায়। বাসগুলোতে ওঠার মত জায়গা থাকে না। তিস্তার ওপর সেতুটি যেদিন খুলে দেওয়া হবে, তারপর থেকে হুজুরের মেলায় লোক আসার সংখ্যা যে কয়েকগুণ বেড়ে যাবে, সে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

গরমের লম্বা বিকেল আস্তে আস্তে ঠান্ডা হচ্ছিল। মনে হল হলদিবাড়িতে বৃষ্টি হবে। এই সময়ে হলদিবাড়িকে বেশ সুখি সুখি মনে হচ্ছিল। ছোট হলেও ডুয়ার্সের আর পাঁচটা ছোট শহরের তুলনায় হলদিবাড়ির অনেক কিছু আছে। হলদিবাড়ির মানুষের কাছে ট্রেনে চেপে কলকাতায় যাওয়াটা কোনও সমস্যাই নয়। একদা শেয়ালদা থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস পরে দার্জিলিং মেল বর্তমান বাঙলাদেশের মধ্যে দিয়ে হলদিবাড়ি হয়ে শিলিগুড়ি যেত। তখন হলদিবাড়ির মানুষকে নিয়ে কলকাতার ট্রেন ছুটত দক্ষিণ দিকে। এখন হলদিবাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে ট্রেন যায় প্রথমে উত্তরে।

আমি স্টেশানে নামার আগে ট্রেনের এক সহযাত্রীকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'বলুন তো কলকাতা কোন দিকে?'

তিনি খানিকটা হেসে উত্তরদিকটা দেখিয়ে বললেন, 'ওই দিকে। কে না জানে?'

আসলে ডুয়ার্সের দক্ষিণে থাকা কলকাতা যেতে ট্রেনের এই উত্তরমুখি গতিই অনেক বছর ধরে বাস্তব। আপনিও হলদিবাড়ি স্টেশানে দাঁড়িয়ে কাউকে এই প্রশ্নটা করে দেখতে পারেন। মজা হবে।

বাস ধরে ফিরব। তাই আবার এ রাস্তা সে রাস্তা বেয়ে ফাইনালি স্টেশন রোড ধরে উঠলাম হলদিবাড়ি রোডে। আর যাই হোক, আয়তনের তুলনায় হলদিবাড়িতে মন্দির-মসজিদের অভাব নেই। এই রোডটাই শহরের ব্যস্ততম এলাকা। পুব দিকে সোজা চলে গেছে তিস্তার দিকে। দেওয়ানগঞ্জ কি হেমকুমারীর দিকে। পশ্চিম দিকটা ধাক্কা খেয়েছে বাঙলাদেশ সীমান্তে। হেমকুমারীর চারপাশে কত সব আশ্চর্য নামের জনপদ ছিল না! আমি স্মৃতি হাতড়ে বেড়াতে শুরু করলাম। সে-ই কলেজ বেলায় ছাত্র রাজনীতির দিনে ক্যাম্পেইন করতে আসা। আবছা আবছা মনে পড়তে লাগল কয়েকটা শব্দ— হুদুমডাঙ্গা, বাজেজামা, গোলাপদি, সামিলবাস।

এই সব নামে কোথাও আর্যামি নেই। আচ্ছা, কেউ কি কখনও হলদিবাড়ির ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন?

মনোরম বিকেলে হলদিবাড়ি রোডের এক দোকানে কিঞ্চিৎ খাদ্যগ্রহণ করে এনবিএসটিসির বাসে উঠে পড়লাম। আসনে হেলান দিয়ে একটা ভ্রমণ পরিকল্পনা ভাবতে লাগলাম মনে মনে। পর্যটক সোজা নামবে হলদিবাড়ি স্টেশানে। তারপর সেখান থেকে তিনবিঘা-জল্পেশ হয়ে ডুয়ার্সে জঙ্গলে কি হিমালয়ে। নির্মিয়মান সেতু হলদিবাড়ি আর মেখলিগঞ্জকে জুড়ে দিলেই এই পরিকল্পনা সফল।

সাফল্যের আনন্দে আমি মনে মনে কার জানি লেখা একটা ছড়া আবৃত্তি করতে করতে জানলা দিয়ে তাকালাম। হলদিবাড়ি দূরে চলে যাচ্ছে। চকচকে রাস্তা দিয়ে বাস ছুটছে হু হু করে। আমি জানলা দিয়ে আসা চমৎকার বাতাস মুখে মাখতে মাখতে বলতে লাগলাম— হেই গাড়োয়ান জলদি গাড়ি /চালাও, যাব হলদিবাড়ি।

এটা মনে হয় কোনও সব্জিপ্রেমির কথা। হয় তো গাড়ি বোঝাই হলদিবাড়ির বিখ্যাত সব্জি আনতে ছুটছিলেন তিনি। তাই আনন্দে ছড়া কাটছিলেন। কিন্তু সব্জি যারা সেখানে ফলায় সেই কৃষকদের অবস্থা হলদিবাড়িতে কেমন? অবশ্য প্রশ্নটা বোকার মত হল একটু। যে দেশে কৃষকদের সামাজিক সম্মান ঘুষখোরদের থেকে কম সে দেশের হলদিবাড়িতে তাঁরা কী আর আলাদা হবেন! এ ব্যাপারে হলদিবাড়ি জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মসজিদের আল্লা আর মন্দিরের শিব-মনসা-কালি-দুর্গারা সমান উদাসীন।

এটাও একধরণের সম্প্রীতি বটে।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

আপার কুমাই অপার চোখে

বেঞ্চ, লকড়ির উনুন। মাঝে মাঝে হাতিরা দল বেঁধে চা-বিস্কুট খেতে আসে। রাগ হলে ভাঙচুর করে। সেই জন্য জোড়াতালি দিয়ে চলছে। পথে যেতে যেতে অনেকে এসে বসেন গলাটা ভেজানোর জন্য তারা কেউ ঝালং, কেউ নাগরাকাটা, চালসা— যার যেদিকে গন্তব্যস্থল। আমার শৈশবের পছন্দের 'এস' বিস্কুট। চায়ের গ্লাসে ডুবিয়ে খাওয়ার আনন্দ। বছর পঞ্চাশ আগে খুনিয়া মোড়ের নির্জনতা, শুনশান পরিবেশ ছিল। এখন অনেকটাই নাই। মানুষের সংখ্যা থেকে যানবাহন হু হু করে বাড়ছে। কমছে গাছপালা। খুনিয়া থেকে হেঁটে চাপড়ামারি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বনবাংলো, চাপড়ামারি রেল স্টেশনে যাওয়ার স্মৃতি মনে পড়ে। সেসব নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করেছি। লেবেল ক্রশিং ডান্ডা পড়েছে। লাল বাতি জ্বলছে। কেবিনম্যান দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখে। ইঞ্জিনের মাথা। গাড়ি থেকে নেমে দেখি অরণ্য ফুঁড়ে কী সুন্দর রেলপথ প্রসারিত। বনভূমি কাঁপিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার মত 'সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস' মিলিয়ে গেল। এইসব ছোট ছোট দৃশ্য দেখে মজা লাগে। জঙ্গল খানিক হালকা হয়ে এল খুমানি বিটে। চারিদিকে লাঠার স্তূপ। লজঝর কাঠের ঘরবাড়ি পেরিয়ে বাঁ দিকে কুমাই যাওয়ার পথ।

পথ মোটামুটি একটু এবড়োখেবড়ো। দু'পাশে লোকালয়, কিছু দোকানপসার। সাপ্তাহিক হাট বসে। অনেক বছর আগে মেটেলি চা-বাগান, বড় সাহেবের কোঠির পাশে লোয়ার কুমাই হয়ে ঝালং, প্যারেন, বিন্দু, বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন কুমাই নিয়ে মাতামাতি হয়নি। হোমস্টে-ও ছিল না। আপার কুমাই, রংগো, নকশাল খোলা, দলগাঁও, মৌরী, গৈরীবাসে পাহাড়ের নানা জায়গায় এখন হোমস্টে-র ছড়াছড়ি। লোকালয় ছাড়িয়ে চা-বাগান, পাতি কারখানা, কোয়ার্টার শুরু। ল্যান্ডস্কেপও পাল্টাতে থাকে। উঁচুনিচু ঢেউয়ের মত কী সুন্দর পথ! দু'ধারে চা-গাছ, মাঝে মাঝে ছায়াগাছ যেন সবুজ চন্দ্রাতপের মত। সত্যি মোহময়ী ডুয়ার্স। পথে যেতে যেতে এই শোভা দু'চোখ ভরে দেখি। কোনওদিন পুরনো হবে না। জুরন্তীর কাছে ইংগো,

চিলৌনি চা-বাগানের সবুজ রঙে মাখা অপরূপ দৃশ্যাবলী এই ঘনঘোর বর্ষায় হাঁ করে শুধু চেয়ে থাকা। মেয়ে, বউরা বোচকার মধ্যে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তুলছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই চিরন্তন দৃশ্য যখনই দেখি দাঁড়িয়ে পড়ি। ক্যামেরা খুলে ছবি তোলা শুরু করি। ওমা কোথা থেকে মোটর সাইকেলে যমদূতের মত একজনের আবির্ভাব— আপ কিঁউ তসবির খিচতা হ্যায়? নে মরণ! কী হল আবার। চা-বাগানে ছবি তোলা বারণ এ জীবনে শুনিনি। অগণিত চা-বাগান পরিক্রমা করেছি কিন্তু কোথাও শুনিনি চা-বাগানের ছবি তোলা যাবে না। ভাইরে আমরা সন্ত্রাসবাদী নই। প্রকৃতিপ্রেমী। ন্যাচারালিস্ট।

পরিমল বলে— দাদা ক্যামেরা ব্যাগে ঢোকান। কী আর করবেন! ধীরে ধীরে চড়াই ভেঙে উপরে ওঠা। চিকরাশি, ওদাল, গামহার, শাল, চাপ কত বিচিত্র রকম গাছ। বন্য পুষ্পে ঠাসা। পাহাড়ের পথ এঁকেবেঁকে উপরে উঠছে। থাপা মশাইয়ের গোর্খা হোমস্টে-তে সামান্য পাকদণ্ডী পথ পার হলে স্বর্গের সিঁড়িতে পৌঁছে গেলাম। সম্মুখে সবুজ মখমলে চাদর যেন ঝুলে পড়েছে। কুমাইকে ঘিরে স্থানীয় গ্রামবাসীরা চাষবাস যেমন রাইশাক, কুয়াশ, আদা, কিছুটা বড় এলাচ, ঝাড়ুগাছ কুমাইয়ের সাপ্তাহিক হাটে বিকিকিনি হলেও লাদানো জিপে চলে আসছে শিলিগুড়ি।

বড় সুন্দর জায়গা। অনেক টুরিস্ট খুঁজে মরেন অফবিট ডেস্টিনেশন লোকেশন, মানে একটু নিরিবিলি দিন যাপন। হৈ হুল্লোড় নৈব নৈব চ। সেদিক থেকে বিজয় থাপা সফল বলে আমার মনে হয়। একদা ফৌজিতে গোর্খা রেজিমেন্টে ছিলেন। তারপর তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ড. জৈল সিংয়ের দেহরক্ষী ছিলেন। মিতভাষী থাপামশাই পর্যটকদের কথা ভেবে তিনটে ঘরকে হোমস্টে-র ধ্যান ধারণায় চমৎকার সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছেন। টাকাপয়সা নিঃসন্দেহে প্রয়োজন কিন্তু পরমার্থ নয়। হাসিখুশি এই মানুষটা খুব মিশুকে। চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। আর ভিড় করেন বঙ্গ সন্তানেরাই বেশি। ভূমণ্ডলে বাঙালিদের মত এরকম বেড়ানো রোগে আক্রান্ত মানুষ আর মেলে না। পুজোর ছুটিতে বেরিয়ে পরা। ফার ফ্রম ম্যাডিং ক্রাউড, শহরের কোলাহল থেকে দূরে এত সুন্দর শান্তির নীড় ভাবাই যায় না। বারান্দায় বসুন, পুষ্প বাগিচায় বসুন, চোখ মেলে দেখুন প্রকৃতিকে। কাছেই কুমাই খোলা, সকসকে খোলা। একটু পা চালিয়ে গেলে সানসেট পয়েন্ট, নেচার ট্রেল, পাখিবাবুদের জন্য চমৎকার আস্তানা। দূরবীন ক্যামেরা নোটবুক নিয়ে বসে পড়ুন উষালগ্ন থেকেই। কাছেই কুমাই চা-বাগান। অরগানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন হচ্ছে। কারখানায় গিয়ে চা তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি চাক্ষুষ করুন, স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে গল্প করুন। সুখ-দুঃখের ভাগীদার হোন। ভাল লাগবে। দিন কয়েক এখানে পরমানন্দে কাটিয়ে অক্সিজেন নিয়ে ফিরে চলুন আপনার ঠিকানায়। কুমাই থেকে আশপাশের সমস্ত সৌন্দর্যখনি বেড়ানোর সুলুক-সন্ধান থাপাবাবুর কাছেই পেয়ে যাবেন। থাপাবাবু আমাদেরকে দুধ দিয়ে আপ্যায়ন করেন। বললেন— চা তো প্রতিদিন পান করেন। খাঁটি দুধ একটু পান করে যান। এখানে ভেজাল বস্তু কমই পাবেন। জৈব সারে উৎপাদিত হচ্ছে শাকসবজি।

যোগাযোগ ঃ বিজয় থাপা, কুমাই, গোর্খা হোমস্টে, গ্রাম পঞ্চায়েত গরুবাথান, থানা জলঢাকা, ঝালং। ফোন ৯৪৭৫৯১১১২৫।
মেল kumaibejoy@gmail.com

ওয়েবসাইট www.kumaigorkhahomestay.com।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

রানিচেরা রাঙ্গামাটি

ডুয়ার্সে আদর্শ চা বাগানের ছবিতে ইকো পর্যটনের আহ্বান

শিলিগুড়ি থেকে গরুবাথান এর দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। নিজের গাড়িতে কিংবা ভাড়া ট্যাক্সিতে গেলে অনায়াসে দেড় ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়। অবশ্য সেবকের লেবেল ক্রসিং বন্ধ কিংবা ধস বা যানজট হলে আলাদা কথা। বাসে সোয়া দুই ঘন্টা সময় নেয়। বাঘপুল, সেবকেশ্বরী মন্দির, মংপং নেচার রিসর্ট পার হয়ে নিবিড় শালকুঞ্জের শেষে এলেনবাড়ি চা-বাগান। কিছুটা এঁকেবেঁকে রংডং খোলা পার হয়ে ওয়াশাবাড়ি, বাগরাকোট চা বাগান। ডানদিকে লিজ রিভার চা বাগান। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলার ছন্দময় দৃশ্য দেখতে দেখতে ওদলাবাড়ি। ওদলাবাড়ি থেকে ডামডিম মোড় হয়ে গরুবাথান যাবার রাস্তা। রানিচেরা চা-বাগান, ডামডিম সেনা ক্যাম্প, ট্রেনিং সেন্টার। এখানে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ হয়। মালবাজার থেকে সাত কিলোমিটার দূরে ডামডিম মৌজা। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে শিলিগুড়ির উদ্দেশে। ডানদিকের রাস্তা চলে গেছে মীনগ্লাস চা বাগান, পাপরখেতি হয়ে লাভা লোলেগাঁও এর দিকে। আজ এসেছি ডামডিম। জলপাইগুড়ি থেকে মালবাজারের বাস ধরে নেমেছি মালবাজার। তারপর ম্যাজিক গাড়িতে

ডামডিম। ডামডিমে এসে একটা গাড়ি ভাড়া করলাম। সেনা জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেখতে দেখতে রানিচেরা চা বাগানে প্রবেশ করলাম। তবে আমার এবারের সফরে আমি চা বাগান সফরের সাথে সাথে পর্যটনের স্বাদও নেব। তাই দুইদিনের সফরে এবারে তিনটি নয়, রাণিচেরা এবং রাঙ্গামাটি এই দুটি চা বাগান কভার করব। কারণ অসাধারণ ইকো টুরিজমের উপাদান ছড়িয়ে আছে এই বাগানগুলিকে ঘিরে। চা-বাগানের সঙ্গে এই সৌন্দর্য উপভোগ করব এবার, সেরকমই পরিকল্পনা।

রানিচেরা টি গার্ডেন

মালবাজার সাব ডিভিশনের রানিচেরা চা বাগানটি একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পাণি। রানিচেরা টি কোম্পানি নামে টাই এর সদস্যভুক্ত এই বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী শ্যাম কুমার গোয়েল, প্রদীপ কুমার গোয়েল, তনসুখ রাই গোয়েল এবং সূর্যপ্রকাশ মিত্তাল। বর্তমান পরিচালকমন্ডলী ২০০৬ সাল থেকে বাগানের দায়িত্বে আছে, যদিও বাগানটি প্রায় ১১০ বছরের পুরনো। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাগানটি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ কোম্পানির হাত ধরে পথ চলতে শুরু করে এবং বহুবার হাতবদল হয়। গোয়েল এবং মিত্তালরাই বাগানটি পরিচালনা করছেন। কোম্পানির হেড অফিস মেটেলিতে। বাগানে মোট ম্যানেজারিয়াল স্টাফ ১৩ জন। বাগানে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৩টি। যদিও বর্তমানে শাসকদলের ট্রেড ইউনিয়নের প্রাধান্যই বেশি। রানিচেরা চা বাগানটির আয়তন এবং চাষযোগ্য আবাদিক্ষেত্র ১২২৬.৭৯ হেক্টর। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৪৩.০৮ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল সহ মোট চাষযোগ্য আবাদিক্ষেত্র ৭৪৬.৭৩ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু গড়ে ১২০০ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। মোট কর্মরত শ্রমিক ১৩৭২ জন। রানিচেরা চা বাগানে নিজস্ব চা পাতা উৎপাদনের গড় বছরে ২৫-২৬ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত নিজস্ব উৎপাদিত বিক্রয়যোগ্য তৈরি চা ৫-৬ লাখ কেজি। বাইরের বাগান থেকে সংগৃহিত কাঁচা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য তৈরি চা এর পরিমান ৬-৭ লাখ কেজি। মোট বাৎসরিক উৎপাদিত তৈরি চা ১২-১৩ লাখ কেজি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগানে ইনঅরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়।

মোট শ্রমিক আবাস ১০৩৭টি। বাগিচায় শৌচাগারের সংখ্যা ১১৭টি। রানিচেরা চা বাগিচায় হাসপাতাল এবং আউটার ডিসপেনসারি দুইই আছে। বাগিচায় আবাসিক ডাক্তার ও প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা এক জন করে। বাগিচায় নার্সের সহযোগী মিড ওয়াইভস ৩ জন। কম্পাউন্ডার ১ জন। স্বাস্থ্য সহযোগী ২ জন। মেল ওয়ার্ডের শয্যা সংখ্যা ৬টি, ফিমেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ৯টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড ২টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড ১টি। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার আছে। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। চিকিৎসার জন্য গড়ে বছরে ২০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয়। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয় না বললেই চলে। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয় না। রানিচেরা বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার রয়েছেন। কিন্তু শ্রমিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই। বাগিচায় ক্যান্টিন নেই। ক্রেশের সংখ্যা ৪। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে। শৌচালয় নেই। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। শিশুদের পোশাক সরবরাহ করা হয় না নিয়মিত। পর্যাপ্ত পানীয় জল ক্রেশে এবং চা বাগানে সরবরাহ করা হয় না। পানীয় জল সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্য নয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেন্ডেন্ট ৪ জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় নেই। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা হিসাবে একটা বাস আছে। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। রানিচেরা টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে ৬০ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। পি এফ বকেয়া নেই। গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণও বকেয়া নেই। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়। বাৎসরিক বোনাসের হার ২০ শতাংশ।

জলপাইগুড়ি থেকে মালবাজারের বাস ধরে নেমেছি মালবাজার। তারপর ম্যাজিক গাড়িতে ডামডিম। ডামডিমে এসে একটা গাড়ি ভাড়া করলাম। সেনা জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেখতে দেখতে রানিচেরা চা বাগানে প্রবেশ করলাম। তবে আমার এবারের সফরে আমি চা বাগান সফরের সাথে সাথে পর্যটনের স্বাদও নেব। তাই দুইদিনের সফরে এবারে তিনটি নয়, রাণিচেরা এবং রাঙ্গামাটি এই দুটি চা বাগান কভার করব। কারণ অসাধারণ ইকো টুরিজমের উপাদান ছড়িয়ে আছে এই বাগানগুলিকে ঘিরে।

রানিচেরা চা বাগানে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ শেষ করে চললাম গরুবাথান। থাকবো গরুবাথানে। গরুবাথান যাবার এই পথেই লাভা লোলেগাঁও যেতে হয়। অনেকবার এই পথে যাতায়াত করেছি। আগে এই পথ সংকীর্ণ ছিল। ছিল অসমান। এবারে দেখছি প্রশস্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। ফলে ধূলোময় পথ। ধূলোর বাড়াবাড়ি এতটাই যে গাড়ির আসল রং ধূলোয় ঢাকা পড়ে গেছে। বাঁদিকে চেল রোড ধরে যেতে হবে। দারুণ সুন্দর পথ। রানিচেরা, সাইলি, মীনগ্লাস, রাঙামাটি, মিশন হিল হয়ে ভুট্টাবাড়ি। সময়ে অসময়ে, কাজে-অকাজে চা-বাগানে বেড়ানোর সুবাদে ডামডিম এসেছি কিছুদিন আগেও। ডামডিম হয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম ডালিমখোলা ইকো ভিলেজ রিসর্টে। অম্বিয়ক চা-বাগানের নিচে। এর আগেও ডামডিম এসেছি। সেবার দেখেছিলাম মোরগ লড়াই। ডুয়ার্সের হাটে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে ক্রমে রাত হয়েছিল। মিষ্টির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছিল। বাস আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল বাস স্টপেজে।

কিন্তু ফেরার সময় ফিরেছিলাম হাটুরে জিপগুলোতে ডামডিম পর্যন্ত। বিশাল গাছের ছায়ায় নেপালি দিদিভাইয়ের ঝুপড়ি দোকান। ডানদিকে পাহাড়ের ঢালে ফাগু চা বাগান। বাঁদিকে ঝকঝকে পিচঢালা চড়াই পথ নেওরা রেঞ্জ অফিসে যাবার জন্য। দেড় কিলোমিটার দূরে গরুবাথান বাজার, থানা, হাসপাতাল, বনবাংলো। সোনাঝুরি, কৃষ্ণচূড়া, শিরীষ, শিমুল, শিশু, সুপারি গাছের বাগান। পাহাড়ের গায়ে এতো সুপারি বাগান খুব কমই দেখা যায়। এখানকার আবহাওয়া বিদঘুটে। দিনভর মেঘবৃষ্টি এবং রোদ্দুরের খেলা। মিনগ্লাস চা বাগান যেহেতু আগে সার্ভে করা হয়ে গেছে তাই এবারের সফরে আমার চাপ কম। তাই আমার আজকের ডেস্টিনেশন গরুবাথান হয়ে ফাগু।

গুডরিক সংস্থার মীনগ্লাস চা বাগানের ফ্যাক্টরি পার হওয়ার পর পথের দু'পাশে জঙ্গল পথ। এই পথের শোভাবর্ধন করে রেখেছে অরণ্য। ফাগু চা-বাগান অতিক্রম করে গরুবাথান পৌঁছালাম। শহরের ধূসর কালো ধোঁয়া এবং গাড়ির আওয়াজ এবং হৈ হট্টগোলের থেকে অনেক দূরে সত্যিই এক চমৎকার স্পট গরুবাথান। এই পরিবেশে এসে দুটো দিন কাটিয়ে যেতে পারলে পাওয়া যাবে এক অনন্য অনুভূতির আস্বাদ। এ দিন ছিল গরুবাথান এর সাপ্তাহিক হাট। গরুবাথান এর পার্শ্ববর্তী পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম এবং চা বাগানের বাসিন্দাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই হাট। পাহাড়ি সংকীর্ণ পথ। তার উপরেই ব্যবসায়ীরা পসরা নিয়ে বসে। ফলে যানবাহনের জন্য সারাক্ষণ যানজট থাকে। এই পথেই লাভা, লোলেগাঁও এবং কালিম্পং যাতায়াত করা যায় বলে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই পাহাড়ি পথটি। গরুবাথান থেকে রওনা দিই আপার ফাগু। এখানে চেল নদীর পাড়ে সুন্দর বনভোজনের স্থান তৈরি করেছে স্থানীয় মানুষ। চেল নদীকে ঘিরে পাহাড়ের কোলে নদী পাহাড়ের অনবদ্য যুগলবন্দী। এর আকর্ষণে বনভোজনপ্রেমীরা এখানে ভিড় করে। স্থানীয় মানুষ এখানে অস্থায়ী দোকান ঘর তৈরি করেছে বাঁশ, কাপড় এবং টিনের চালা লাগিয়ে শুধুমাত্র বনভোজনের মরশুমের জন্য। এছাড়াও তরল নেশার বস্তুও পাওয়া যায় দেখলাম।

শিলিগুড়ি বা মালবাজার থেকে ডামডিম হয়ে যে পথটি লাভা চলে গেছে সেই পথে গরুবাথান পেরিয়ে কয়েকটা পাক ঘুরতেই রাস্তার বাঁদিকেচোখে পড়বে ফাগু চা বাগান লেখা পাকা সিমেন্টের বোর্ড যার পাশ দিয়ে একটা পিচের রাস্তা সোজা চেল নদীর দিকে নেমে গেছে। যেন হঠাৎ করে লাফিয়ে পড়েছে নদীর ধারে। তারপর নদীর ওপরের লোহার সেতু পেরিয়ে আবার একের পর এক চড়াই ভাঙতে ভাঙতে আপার ফাগু চা-বাগানের বুক ছেড়ে সোজা চলে গেছে ঝান্ডির দিকে। চেলখোলা অর্থাৎ চেল নদীর ওপরের সেতু পেরিয়ে ডানদিকে যে মনোরম স্পটটি রয়েছে সেটা পিকনিকের জন্য একেবারে আদর্শ পরিবেশ। চেলখোলা পাহাড়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে বয়ে চলেছে। নদীর পশ্চিমে কিছুটা পাথুরে এবং কিছুটা সমতল জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে চেল পিকনিক স্পট। ডুয়ার্সের স্থায়ী বাসিন্দা, বিশেষ করে পশ্চিম ডুয়ার্সের মানুষের কাছে গরুবাথানের চেলখোলা বহুদিন ধরেই বনভোজনের জন্য আকর্ষণীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হলেও বছর পাঁচেক আগেও ডুয়ার্সের বাইরের পর্যটকদের কাছে জায়গাটি ততটা পরিচিত ছিল না। চেলকে একটি আদর্শ পিকনিক স্পট হিসাবে গড়ে তুলতে এগিয়ে

চেলের সৌন্দর্যে আর পাহাড়ি মাদকতায় অনন্য গরুবাথান

শহরের ধূসর কালো ধোঁয়া এবং গাড়ির আওয়াজ এবং হৈ হট্টগোলের থেকে অনেক দূরে সত্যিই এক চমৎকার স্পট গরুবাথান। এ দিন ছিল গরুবাথান এর সাপ্তাহিক হাট। গরুবাথান এর পার্শ্ববর্তী পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম এবং চা বাগানের বাসিন্দাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই হাট। পাহাড়ি সংকীর্ণ পথ। তার উপরেই ব্যবসায়ীরা পসরা নিয়ে বসে। এই পথেই লাভা, লোলেগাঁও এবং কালিম্পং যাতায়াত করা যায় বলে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই পাহাড়ি পথটি। গরুবাথান থেকে রওনা দিই আপার ফাগু। এখানে চেল নদীর পাড়ে সুন্দর বনভোজনের স্থান তৈরি করেছে স্থানীয় মানুষ।

রানিচেরা থেকে গরুবাথানের পথে গুডরিকসের সেরা বাগান মীনগ্লাস

এসেছে স্থানীয় প্রশাসন। নদীর পাড়ের সমতল জায়গায় বানানো হয়েছে মাথায় লাল এবং নীল রংয়ের ছাউনি দেওয়া চারিদিক উন্মুক্ত বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য বসার জায়গা। কোনটা বৃত্তাকার, কোনোটা আবার লম্বা, আর তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলাচলের জন্য তৈরি করা হয়েছে সিমেন্ট কংক্রিটের ঢালাই করা সরু পথ। তৈরি হয়েছে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচালয়।

বনভোজন করতে বেড়াতে আসা উৎসাহীরা চাইলে এখানে ছোটখাটো ট্রেকিংও সেরে ফেলতে পারেন। কারণ পিকনিক স্পটের জন্য সাজান সমতল জায়গাটা পেরোলেই রয়েছে প্রায় ৪০০ ফুট উঁচু একটি খাড়া পাহাড়। যদিও পাহাড়ের মাথাটি একদম খাড়া। আপার ফাগু যাবার রাস্তা ধরে কিছুটা চড়াই ভাঙলেই ডানদিক দিয়ে একটি পায়ে চলা পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়ের মাথায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সামনের স্রোতস্বিনী নদী এবং তার পাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এছাড়া আপার ফাগুর রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই রয়েছে এক বৌদ্ধ স্তূপ। চাইলে সেই স্তূপের চারধারে প্রদক্ষিণ করে প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করে আসা যেতে পারে। সেখান থেকে কয়েক পা এগোলেই আপার ফাগু চা বাগান। পাহাড়ের গা বেয়ে একের পর এক সারিবদ্ধ চারাগাছ সুশৃংখল ছাত্র-ছাত্রীদের মতো হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখান দিয়ে পিচঢালা রাস্তা ক্রমাগত ইউটার্ন করে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। মালবাজার থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরত্বে এমন এক স্বপ্নের দেশ থাকতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

গরুবাথান বাজার থেকে একটু চড়াই পথে হেঁটে থানার পাশ দিয়ে গরুবাথান বনবাংলোর পথ। চারপাশে সুপারি, নারকেল, কাঁঠাল গাছ। আছে কোয়াশ গাছও। পাহাড় তো আছেই, কাঠের বাংলোর আভিজাত্যই আলাদা। চমৎকার লাউঞ্জ। দুখানা শয্যা। ঘর লাগোয়া ডাইনিং হল। ফায়ারপ্লেস আছে। থানা প্রাঙ্গণ থেকে ঘড়িতে ঢং ঢং করে সন্ধ্যা সাতটা বাজল। ঘরে ঢুকে জানলা খুলে দিই। ধূসর জ্যোৎস্নায় বন-পাহাড় বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে। বাংলোর চৌকিদার বড়ই সাধাসিধে, শান্ত, মিতভাষী। ভিজিটরস রেজিস্ট্রার খুলে দেখি কারা কারা এসেছে। আসলে গরুবাথান হল বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। গরুবাথান বনবাংলোতে চাইলেই থাকার অনুমতি মেলে। চেলখোলার সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করে অবশেষে রাত্রিযাপন গরুবাথান বনবাংলোয়। কাল যাবো রাঙ্গামাটি চা বাগান। শুনেছি বাগিচার চাইবাসা ডিভিশনে আছে ব্রিটিশদের সমাধিক্ষেত্র যেটা দেখতে নাকি অনেক পর্যটক আসে মালবাজার থেকে। চাইবাসা সমাধিক্ষেত্রের তথ্য পেয়েছিলাম 'এখন ডুয়ার্স'-এর কোনও একটা লেখায়। তখন থেকেই সময় সুযোগ পেলে যাবার ইচ্ছা মাথায় ছিল। তবে আবার সামনের সপ্তাহে আসব গরুবাথান। থাকব এখানে। নেওড়া রেঞ্জের রেঞ্জার সাহেব আমার লেখালেখির নেশা শুনে অনুমতি দিয়েছেন বুড়িখোলা বিট হয়ে সাকাম যাবার। তবে রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে গাড়িতে এবং বনরক্ষিদের সঙ্গে। কারণ একপাল হাতি বুড়িখোলা বিটে নাকি ঝঞ্ঝাট শুরু করেছে। উত্তেজনায় রাতে ঘুম আসতে দেরি হল। তার আগে খেতে বসে কেয়ারটেকারের কাছ থেকে গরুবাথান এর গল্প শোনা হল। হাতি নাকি এখানে হামেশাই আসে। গতবছর এই বাংলোর সামনের মাঠে দুই দাঁতালের লড়াই হয়েছিল। সে নাকি দারুণ রোমাঞ্চকর দৃশ্য!

রানিচেরা টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে ৬০ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। পি এফ বকেয়া নেই। গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণও বকেয়া নেই।

রাঙ্গামাটি টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে ১ কোটি ২১ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। বোনাসের পরিমাণ ২০ শতাংশ। পিএফ বকেয়া নেই। বছরে গড়ে ৭৫ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়।

রাঙ্গামাটি টি গার্ডেন

মালবাজার সাব ডিভিশনের রাঙ্গামাটি চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী অ্যামালগামেটেড প্ল্যান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। বাগানটি ডি বি আই টি এ সংগঠনের সদস্য। বাগানটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি। বাগানে মোট ম্যানেজারিয়াল স্টাফ ৯ জন। বাগানে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৩টি। রাঙ্গামাটি চা বাগানটির আয়তন ৭৬১.২২ হেক্টর এবং চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ১৪২৭.৭৭ হেক্টর। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৮৬.৬৮ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত মোট চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র অঞ্চল ৭৫৭ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৬৯৫ কেজি করে চা ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়। মোট কর্মরত শ্রমিক ২২৫৫ জন। রাঙ্গামাটি চা বাগানে নিজস্ব চা পাতা উৎপাদনের গড় ৬০ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব উৎপাদিত চা ১২-১৩ লাখ কেজি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগানে ইঅরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। রাঙ্গামাটি চা বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত

গরুবাথান বনবাংলোর পথে

রাঙামাটি চা বাগানের বাংলো থেকে চা বাগিচা

উন্নতমানের বাগান।

বাগিচায় শৌচাগারের সংখ্যা ১৩১৬টি। রাঙ্গামাটি চা বাগিচায় হাসপাতাল আছে। ডিসপেনসারিও আছে। এমবিবিএস ডাক্তার আছেন। প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা ২ জন। বাগিচায় নার্সের সহযোগী মিডওয়াইভস ৪ জন। কম্পাউন্ডার ২ জন। স্বাস্থ্য সহযোগী ১ জন। মেল ওয়ার্ডের শয্যাসংখ্যা ১৪টি, ফিমেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৬টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড ৪টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড ৫টি। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার আছে। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। চিকিৎসার জন্য গড়ে বছরে ২৬০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয়। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয়। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরন করা হয়। বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আছে। বাগিচায় ক্যান্টিন আছে। ক্রেশের সংখ্যা ৭টি। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে। শৌচালয় আছে। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের দেওয়া হয়। শিশুদের পোশাক সরবরাহ করা হয় না নিয়মিত। পর্যাপ্ত পানীয়জল ক্রেশে এবং চা বাগানে সরবরাহ করা হয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেন্ডেন্ট ১২ জন। তারাই মিলেমিশে বাচ্চাদের দেখভাল করে। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় বেশিদূরে নয়। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা হিসাবে একটা বাস আছে। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। রাঙ্গামাটি টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে ১ কোটি ২১ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। বোনাসের পরিমাণ ২০ শতাংশ। পিএফ বকেয়া নেই। বছরে গড়ে ৭৫ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়।

মালবাজার শহর থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার এগোলে নিউ রেলওয়ে ওভারব্রিজ। এখান থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে রাঙামাটি চা-বাগানের রাস্তা। সবুজ গালিচা বিছানো বাগিচার বুক চিরে উঁচু-নিচু ঢেউয়ের মতো পথ ধরে যে রাস্তা পেরিয়ে গেছে এই চা বাগানের একের পর এক ডিভিশন। কবিতার মতো

সবুজ গালিচা বিছানো বাগিচার বুক চিরে উঁচু-নিচু ঢেউয়ের মতো পথ ধরে যে রাস্তা পেরিয়ে গেছে এই চা বাগানের একের পর এক ডিভিশন। কবিতার মতো তাদের নাম। স্প্রিংফিল্ড, সুন্দরী লাইন, চাইবাসা ইত্যাদি। চা-বাগানের ফ্যাক্টরি, স্টাফ কোয়ার্টার, আবাসন পেরিয়ে রাস্তা গিয়েছে ওভারব্রীজ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরের চাইবাসা ডিভিশনে যার পূর্বপ্রান্তে জনবসতির অদূরে গাঢ় সবুজের মাঝে প্রাচীর ঘেরা প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে রয়েছে এমন এক সমাধিস্থল যেটি শ্বেতপাথরে মোড়া এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত এই সমাধিস্থলে যারা ঘুমিয়ে আছেন তারা কেউই দেশের নাগরিক নন, প্রায় সকলেই ইংরেজ।

তাদের নাম। স্প্রিংফিল্ড, সুন্দরী লাইন, চাইবাসা ইত্যাদি। চা-বাগানের ফ্যাক্টরি, স্টাফ কোয়ার্টার, আবাসন পেরিয়ে রাস্তা গিয়েছে ওভারব্রীজ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরের চাইবাসা ডিভিশনে যার পূর্বপ্রান্তে জনবসতির অদূরে গাঢ় সবুজের মাঝে প্রাচীর ঘেরা প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে রয়েছে এমন এক সমাধিস্থল যেটি শ্বেতপাথরে মোড়া এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত এই সমাধিস্থলে যারা ঘুমিয়ে আছেন তারা কেউই দেশের নাগরিক নন, প্রায় সকলেই ইংরেজ। ব্রিটিশরাজ যখন ডুয়ার্সে চা-বাগানের পত্তন করেন তখন যে সমস্ত ইংরেজ সাহেব এই জঙ্গলঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে এসেছিলেন চা বাগানের মালিক হিসাবে বা ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে, মৃত্যুর পরে তাদের সমাধিস্থ করার জন্যই এই সমাধিস্থল নির্মিত হয়।

আজ থেকে ১২০ বছর আগে ১৮৯৫ সালের ২৪ শে জুন মাত্র ২৪ বছর বয়সে এই পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চলে যেতে হয়েছিল উইলিয়াম কসকে। তার সমাধির ওপরে শ্বেতপাথরের স্মৃতির ফলকে ইংরেজি ভাষায় খোদাই করে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখে দিয়েছিল এক নামহীন কবি অথবা তার কোনো প্রিয়জন। আজও সেই কবিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয় আত্মীয় বিয়োগের ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে সমাধিস্থলের বাতাস। আশ্চর্যের বিষয় এদের বেশিরভাগেরই মৃত্যু হয়েছিল অনেক কমবয়সে। কেউ ৪৯, কেউ ৩৩ বছর বয়সে, আবার কেউ চলে গিয়েছিলেন মাত্র ২৪ বছর বয়সে। সম্ভবত ডুয়ার্সের মারণরোগ কালাজ্বর অথবা ম্যালেরিয়াই তাদের অকাল মৃত্যুর কারণ। কেউ তার প্রেয়সীকে কেউ বা তাদের একমাত্র পুত্রকে এই সমাধিস্থলে চিরশায়িত রেখে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। লিস রিভার চা-বাগানের অ্যান্ডারসন দম্পতির একমাত্র পুত্রের মাত্র ২৭ বছর বয়সে অকালপ্রয়াণ ঘটে। সেই জেমস অ্যান্ডারসনকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। আবার সাতখাইয়া চা বাগানের ফ্রেডারিক চার্লস জর্ডন ১৯২৩ সালের ১৮ নভেম্বর মাত্র ২৫ বছর বয়সে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার পর তার মরদেহ সমাধিস্থ হয়েছিল নিজের জন্মভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের রাঙ্গামাটি চা বাগানের চাইবাসা সমাধিস্থলে। বড়দিঘি চা বাগানের আগাসি সম্ভবত শেষ ইংরেজ যাকে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে ১৯৬৮ সালের ৬ মার্চ মৃত্যুর পরে এই সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়। এখনও রয়ে গেছে প্রিয়জনের স্মৃতিতে তৈরি বেশ কিছু নির্মাণ। যেমন ডব্লিউ ডি এল তার ৪৯ বছর ১১ মাস ৩ দিন বয়সী মেরিয়ানের স্মৃতিতে তার কবরের উপরে তৈরি করেছিলেন এক অপরূপ সুন্দর শ্বেতপাথরের পরি। হাতদুটো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হলেও অক্ষত আছে ডানা জোড়া। যেন পাখা মেলে উড়ে যাবে আকাশে। কেউ আবার প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে লিখেছেন মর্মস্পর্শী কবিতা। যেমন এটি এমন এক ঐতিহাসিক সমাধিস্থল রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে যেটির করুণদশা। সীমানা প্রাচীরের গায়ে, প্রবেশদ্বারটির ছাদে, দেয়ালের গায়ে এবং সমাধিগুলির গায়ে দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করায় ধুলো ময়লা এবং শ্যাওলার মিশ্রণে পুরু আস্তরণ পড়ে গেছে। প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্বেতপাথরে খোদাই করা কবিতা বা লেখার পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। আগে এই সমাধিক্ষেত্রের ভিতরে প্রচুর ওষধি গাছ ছিল বর্তমানে যেগুলির কোনও অস্তিত্ব নেই। অথচ মালবাজারকে কেন্দ্র করে পর্যটনের বিকাশে বর্তমান সরকার যেভাবে উদ্যোগী হয়েছে তাতে ডুয়ার্স বেড়াতে আসা অসংখ্য পর্যটকের কাছে অন্যতম দ্রষ্টব্য হয়ে উঠতেই পারে ইংরেজ সাহেবদের এই সমাধিক্ষেত্র। শুধু তাই নয়, বিদেশি পর্যটকদের কাছে বেড়ানোর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে এই স্থান।

ভীষ্মলোচন শর্মা

দীপশ্রীদের অনুভব ক্লিষ্ট কন্যার চোখে আলো জ্বালে

হাতছানিতে বাগানের আদিবাসি কিশোরী যুবতীরা পাচার হয়ে যায় সহজেই । পেটের তাড়নায় জেনে বুঝেও মেয়েকে অজানা অন্ধকারের পথে ঠেলে দেয় দরিদ্র বাবা-মায়েরা, কিছু পয়সার বিনিময়ে। এসব করুণ কাহিনি আজ আর কারও অজানা নয়।

হোমের কন্যারা দীপশ্রীদের আদরের ধন। ওদের কমন জন্মদিন 'অনুভব' হোমে অনুষ্ঠিত হয়, প্রতি বছর ৩১শে ডিসেম্বর। অতিথিরা আসেন, মেয়েরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। একটু ভালমন্দ খাওয়াদাওয়া, ছোটখাট উপহার আদান-প্রদান, খুব ভাল কাটে দিনটি।

এইতো সেদিন হোয়াটস অ্যাপে একটা বিয়ের চিঠি এল। দীপশ্রীদি পাঠিয়েছেন। নিচে আলাদা করে আন্তরিক কয়েক লাইনের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ, শেষের কথা লক্ষ্মীর বিয়েতে আসতেই হবে। লক্ষ্মী মানে মিষ্টি ব্যবহারের সেই মেয়েটা যে জলপাইগুড়ি পোস্ট অফিসের মোড়ে কর্মতীর্থের ক্যান্টিনটায় প্রচুর উদ্দীপনা নিয়ে গ্রাহক সামলাত, ছুটে ছুটে খাবার তৈরি করত। 'অনুভব' হোমের আবাসিক ও এক সার্থকনামা মেয়ে, বিয়ের পর আলো করে থাকবে সংসার নিশ্চিত। লক্ষ্মীর মত মেয়েদের সুরক্ষা ও শিক্ষার বৃত্তে স্বাভাবিক জীবনের পথ দেখানোর যে চেষ্টা জলপাইগুড়ির 'অনুভব' হোম নিরন্তর করে চলেছে, সামান্য কিছু শব্দে তার ছবি আঁকা যাবে না।

ডুয়ার্সে নারীপাচার এক গভীর সামাজিক সমস্যা। এখানে প্রায় এগার লক্ষ মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ ভাবে চা বাগানের উপর নির্ভরশীল। কখনও পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে, কখনও বা যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগের অভাবে বা অপরিণামদর্শী ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের কারণে একের পর এক চা বাগান বন্ধ হয়েছে, শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছে, রোজগার বন্ধ হয়েছে। অসহনীয় অভাবে কাজের প্রলোভনে, উন্নত জীবনের

বেশ কিছুদিন আগে দিল্লির বঙ্গভবনে ডর্মিটরিতে আমার পাশের বেডে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নারী-পাচার রোধ বিভাগের একজন অফিসার। একদিন কাকভোরে বেরিয়ে গভীর রাতে ফিরেছিলেন, হরিয়ানার গ্রাম থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন এক তরুণীকে। পাচারকারীরা মেয়েটিকে এক বুড়োর কাছে চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিল। আর একটি মেয়েকে অল্পের জন্য উদ্ধার করতে না পারার আফশোস করছিলেন অফিসার, মেয়েটির মা নাকি অধীর অপেক্ষায় আছে দক্ষিণ ২৪-পরগনার এক গ্রামে।

তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের ফিরে পাওয়া সত্ত্বেও নিজের পরিবারেরর লোকেরা সামাজিক বয়কটের আশঙ্কায় বাড়িতে নিতে চায় না। তাই তারা আবার অন্ধকার গলিপথে চিরতরে হারিয়ে যায়। ২০০৪ সনে জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানায় 'বন্ধন' নাম দিয়ে পরিবার পরামর্শ কেন্দ্র (ফ্যামিলি কাউন্সিলিং সেন্টার) চালু হয়, তৎকালীন এসপি শ্রী অজয় নন্দার উদ্যোগে জেলা পুলিশের অধীনে কেন্দ্রটি কাজ শুরু করে, অল্পদিনের মধ্যেই সুনাম অর্জন করে। পরামর্শ দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন জলপাইগুড়ি মহিলা কল্যাণ সংঘ পরিচালিত 'ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি সেন্টার' কমিটিতে ছিলেন এনজিও প্রতিনিধি, মহিলা আইনজীবি, কয়েকজন প্রধান শিক্ষিকা। বন্ধনের কাজে সূচনা থেকেই গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েন শ্রীমতি দীপশ্রী রায়।

ইতিমধ্যে কলকাতার প্রথিতযশা এনজিও 'সংলাপ' দিল্লি জয়পুর মুম্বাই থেকে উদ্ধার করা ডুয়ার্সের তিনটি মেয়ের বাড়ি খুঁজে দিতে অনুরোধ করেন। জেলা পুলিশের সাহায্যে নিয়ে তিন জনের বাড়ির খোঁজ পাওয়া যায়। তিনজনকেই তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। তার একমাস পর, আবার চা বাগানের দুটো মেয়েকে পাঠায় 'সংলাপ', এক সপ্তাহের মধ্যে আরও চারটে মেয়ে। দীপশ্রীরা 'সংলাপ'-এর সম্পাদিকা শ্রীমতি ইন্দ্রানী সিনহাকে জানান 'কাজ করতে পারছি না, কারণ মেয়েদের সুরক্ষিত আশ্রয় দিতে হবে নইলে আবার পাচার হয়ে যেতে পারে'। অবশেষে দশজনের থাকার ব্যবস্থা করার অনুমোদন মেলে। তৎকালীন জেলা শাসক, জেলা জজ, এসপি এবং অন্যান্যরা নানাভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ২০০৫ সালের ১৪ই নভেম্বর শিশু দিবসে সংলাপের আর্থিক সহযোগিতায় জয়ন্তীপাড়ার ভাড়া বাড়িতে উদ্ধারপ্রাপ্ত মেয়েদের অনুভব হোম চালু হয়। এর পরেই পনেরটি উদ্ধারপ্রাপ্ত মেয়েকে রাখার অনুমতি মেলে। যাদের বাড়ি পাওয়া গেল, যারা বাড়িতে স্থিতি পেল তারা হোম ছেড়ে গেল, বাকিরা রয়ে গেল। যারা বাড়িতে স্থান পেল তাদের শূন্য জায়গায় নতুন মেয়েদের কলকাতা থেকে পাঠানো চলতেই থাকে। ২০০৬ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তর 'অনুভব' কে নিজস্ব হোম পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান করে। বর্তমান ক্লাব রোডের জায়গাটি জলপাইগুড়ি পুরসভা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কলেবরে বৃদ্ধি ঘটায় সে পরিসরও ছোট হয়ে এসেছে।

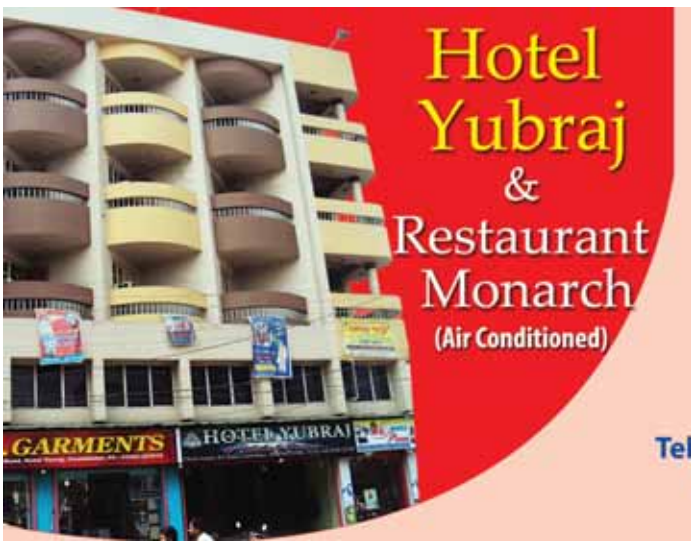

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

দীপশ্রী হোমের সবার কাকিমা। কাকিমা মানে নিজের লোক, আত্মীয়। মেলামেশার ক্ষেত্রে কোনও বাধা, কোনও সংকোচ নেই। আড়াই বছরের শিশুকে ট্রেনের বাথরুম থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। শিশুটি এখন বেশ বড়। পড়াশুনো করে, খেলাধুলো ও নাচ গানেও তার সমান উৎসাহ। কারও বাবা অথবা মা যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত, শিশুটি হোমে বড় হচ্ছে। বাচ্চারা স্কুলে পড়াশুনো করতে যায়, হোমে নাচগান শেখানোর ব্যবস্থা আছে। নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মেয়েরা শিখছে মার্শাল আর্ট-তাইকোন্ড। শিখছে বলা ঠিক হবে না, রীতিমত পারদর্শী হয়ে উঠছে। রাখী, নিকিতা, কোয়েল রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় জিতে পুরস্কার নিয়ে এসেছে। কোয়েল আমাকে স্বাধীনতা দিবসের দুপুরে, খোলা উঠোনে অনবদ্য এক রাগাশ্রয়ী গান শুনিয়েছিল।

হোম থেকে প্রকাশিত পত্রিকার নাম 'কথা নদী'। আবাসিকরা পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখছে। ১৪ই আগস্ট কন্যাশ্রী দিবসে ওদের অনুষ্ঠান পরিবেশনা দর্শক ও শ্রোতাদের প্রশংসা লাভ করেছে। ১৫ই আগস্ট ২০১৮ তারিখে জলপাইগুড়ির জেলার প্রশাসনিক স্তরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে 'অনুভব' হোমের কন্যারা অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে।

হোমের কন্যারা দীপশ্রীদের আদরের ধন। ওদের কমন জন্মদিন 'অনুভব' হোমে অনুষ্ঠিত হয়, প্রতি বছর ৩১শে ডিসেম্বর। অতিথিরা আসেন, মেয়েরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। একটু ভালমন্দ খাওয়াদাওয়া, ছোটখাট উপহার আদান-প্রদান, খুব ভাল কাটে দিনটি।

৫০ জন আবাসিকের ব্যবস্থা আছে, বর্তমানে ৪৭ জন আবাসিক আছেন। ১৮ বছর বয়স হলে তাকে আর হোমে রাখা যাবে না। মেয়েরা হোমের মারফত দক্ষতা বৃদ্ধির ট্রেনিং নিয়ে জীবিকার ক্ষেত্রে নিজেকে যুক্ত করেছে। যেমন শিলিগুড়ির একটি চক্ষু চিকিৎসালয়ে একটি মেয়ে কর্মরতা। মেয়েরা জেলা গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় জেলা পরিষদের পাশে 'কর্মতীর্থ' ভবনে ক্যান্টিন চালায়। আমার মনে হয়েছে আরো বেশি কাজে লাগবে এমন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

দীপশ্রী বলছিলেন, নিজের প্রিয়জন হারিয়ে গেলে মনেপ্রাণে কী বিপুল ব্যথা হয় তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে। যেমন পঁয়ত্রিশ বছর আগে টিউশনি পড়তে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল দীপশ্রীর বারো ক্লাসে পড়া সমবয়সী পিসতুতো ভাই, সে ব্যথা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে আজও। তাই যখন সুযোগ এল হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে তার বাড়ি খুঁজে তাকে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার, সে সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। তেমনই হারিয়ে যাওয়ার আট বছর পর একদিন হঠাৎ যখন দুটি মেয়ের বাড়ি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, তখন তাঁর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না।

ইতিমধ্যে হোমের তিনটি মেয়ের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সুখেই সংসার করছে। এখনও তাদের বাপের বাড়ি 'অনুভব'। তিনটি নাতি নাতনির গর্বিত দিদিমা দীপশ্রী। যেদিন ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখনও হোমে উৎসবের আবহ। উঠোনে ছোট্ট প্যান্ডেল দেখেই বোঝা যাচ্ছিল আবার একটা বিয়ে আসছে। জানতাম লক্ষ্মীর বিয়ে সামনেই, সেদিন আইবুড়ো ভাত। বাকি মেয়েগুলির চোখেমুখে খুশির আলো এসে পড়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

ভারতীয় সংবিধানে নারীর অধিকার

ভারতীয় সংবিধান আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আইন। এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলে ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সাথে, এই দেশের নাগরিকবৃন্দের জন্য ন্যায়বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার্থে নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগরিত করে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের এই অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের দেশকে নিছক ভৌগলিক অস্তিত্বের বাইরেও একটি বিশেষ তাৎপর্য প্রদান করে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে লিঙ্গ সমতার নীতি সুসংরক্ষিত রয়েছে। তবে ভারতীয় সংবিধান কেবলমাত্র নারীদের জন্য সমতা মঞ্জুর করেই থেমে নেই। সেইসাথে, তাঁদের বিরুদ্ধে সদাসক্রিয় ক্রমবর্ধিষ্ণু আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতাগুলিকে ব্যর্থ করতে নারীদের পক্ষে ইতিবাচক বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রকেও বিপুল ক্ষমতা প্রদান করেছে।

সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের। যেমন, সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইন স্বীকৃত প্রক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অর্থাৎ 'জীবনের অধিকার' শুধু শারীরিক অস্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের 'মানুষের মর্যাদা' নিয়ে বাঁচার অধিকার রয়েছে। তবে এই পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোয় কেবলমাত্র নারী হয়ে জন্মাবার কারণে নারীদের কিছু বিশেষ প্রকারের অত্যাচার, নিপীড়ন ও বঞ্চনা সহ্য করতে হয়। যুগযুগান্ত ধরে নারীদের ওপর চলতে থাকা এই লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন ও বঞ্চনা নিরসনে ভারতীয় সংবিধান শুধুমাত্র নারীদের কথা ভেবে তাদের কয়েকটি বিশেষ অধিকার প্রদান করেছেন। ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত নারীদের সেই বিশেষ অধিকার ও রক্ষাকবচগুলি নিম্নরূপ—

আইনের চোখে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমান এবং সকলে সমানভাবে আইনের আশ্রয় পাবেন। - *অনুচ্ছেদ ১৪*

লিঙ্গের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা চলবে না। - *অনুচ্ছেদ ১৫(ক)*

নারীদের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নারীদের পক্ষে ইতিবাচক বৈষম্য সৃষ্টি করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। - *অনুচ্ছেদ ১৫(গ)*

রাষ্ট্রের অধীনস্থ কোন কার্যালয় বা চাকরিতে নাগরিকদের নিয়োগ বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনরূপ পৃথকীকরণ করা চলবে না বা অযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে না। - *অনুচ্ছেদ ১৬*

নারী বেচাকেনা, নারী পাচার, বেগার খাটানো বা অনুরূপ জোরপূর্বক শ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। - *অনুচ্ছেদ ২৩*

যথোচিত জীবিকানির্বাহের উপায়ে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে সঠিক নীতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। - *অনুচ্ছেদ ৩৯(ক)*

নারী ও পুরুষের জন্য কর্মক্ষেত্রে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী নির্দারণের বিষয়ে রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। - *অনুচ্ছেদ ৩৯(ঘ)*

নারী শ্রমিকদের শক্তি ও স্বাস্থ্য যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং আর্থিক অচ্ছলতার কারণে নারীরা যাতে বয়স বা পরিবেশের পক্ষে প্রতিকূল এমন কোন কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য না হন— এ দুটি বিষয়ে রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। - *অনুচ্ছেদ ৩৯(ঙ)*

নারীদের কর্মক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ ও মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করবার জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। - *অনুচ্ছেদ ৪২*

নারীদের মর্যাদা হানিকারক কাজকর্ম বর্জন করা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য। -*অনুচ্ছেদ ৫১-ক (ঙ)*

প্রতিটি পঞ্চায়েতে সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। - *অনুচ্ছেদ ২৪৩-ঘ(৩)*

প্রতিটি পর্যায়ে পঞ্চায়েতের সভাপতির পদের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। - *অনুচ্ছেদ ২৪৩-ঘ(৪)*

প্রতিটি পৌরসভায় সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। - *অনুচ্ছেদ ২৪৩-ন(৩)*

পৌরসভার সভাপতির পদগুলি নারীদের জন্য এমনভাবে সংরক্ষিত থাকবে যেমনটা রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক স্থিরীকৃত হবে। - *অনুচ্ছেদ ২৪৩-ন(৪)*

আমরা সকলেই জানি, আমাদের দেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের এবং নারীর সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার অঙ্গিকার করা হয়েছে। ভারত সরকার সেই মোতাবেক অনেক আইন প্রণয়ন করেছেন এবং সেই আইনের সঠিক প্রয়োগের বিষয়ে তদারকি করতে জাতীয় মহিলা কমিশনও গঠন করেছেন। তবুও ভারতীয় নারীরা নিরাপদে নেই। আজও তারা এ দেশে শারীরিক ও মানসিকভাবে দলিত, নির্যাতিত, অপমানিত ও বঞ্চিত। ন্যায্য অধিকারগুলি তারা ভোগ করতে পারছেন কই? বহু নিরক্ষর, অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, এমনকি শিক্ষিত নারী-পুরুষদের মধ্যেও আইনি সচেতনার অভাবে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার ও কর্তব্যের নিরিখে প্রণিত আইনগুলির সুফল ভোগ করতে পারছেন না নারীরা। আসুন, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে না থেকে সমাজের এই অন্ধকার সময়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে আইনি সচেতন করে, সকলের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগ্রত করবার কাজে ব্রতী হই। স্বীয় অধিকার বোধ জাগ্রত এবং মৌলিক কর্তব্য সচেতন এক সুষম আলোকিত সমাজ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

রাখি পুরকায়স্থ

সংশোধনী— *অগস্ট ২০১৮ সংখ্যায় একটি ভুল রয়ে গেছে। 'আইন ২০০৫' কথাটি আসলে হবে 'গার্হস্থ্য আইন ২০০৫'। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। প্রকাশক*

মায়ের আঁচলে বেঁধে রেখে চলে এসেছিলাম সেই দিনগুলি

রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী, প্রজাতন্ত্র প্যারেড, অনুরোধের আসর, স্বাধীনতার প্রভাত ফেরি, মহালয়ার পিকনিক, পার্কে লুকানো বিকেল, জ্যোৎস্নার আনন্দ— সব নিয়ে দাদাদের প্রটোকলের মধ্যেই নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে চলেছিলাম বেশ। হঠাৎ প্রকৃতি একদিন বুঝিয়ে দিল আমি বড় হয়ে গেছি। মা পদে পদে শেখাচ্ছেন মেয়েদের কী কী করতে নেই। শেখাচ্ছেন তুলসী মঞ্চে লুট, নাটাই পুজো, সন্ধ্যা দেওয়া ইত্যাদি আদর্শ নারী হওয়ার মন্ত্র। তবুও মায়ের সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি আদরের ছলে অনেক কাকু জ্যেঠুর মন্দছোঁয়ার কষ্টটা।

সময় কত দ্রুত চলে যায়? এই তো সেদিন বাবার হাতে বানানো রথে জগন্নাথের ছবির পিছনে বসা আমি, ছোটদাদা আর জ্যাঠতুতো ভাই। পিসেমশায় বলছিলেন, এতো দেখি জ্যান্ত জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম! ছোট্ট শহরে সে কী হৈ হৈ— সবাই রথের রশি টানবে। সারা রাস্তা ভাইটা কেঁদেছিল ভক্তদের ছোঁড়া কলা, লটকা, পয়সার ঢিল খেয়ে খেয়ে।

তেমনি জন্মাষ্টমীও বাবা আমাদের জন্যই প্রথম শুরু করেছিলেন। দু'-তিন বছর বাড়িতে হওয়ার পর, মদনমোহন বাড়ির পুরোহিত কাকু আর বাবার প্রচেষ্টায় মদনমোহন বাড়িতেই হত এইসব উৎসব। মদনমোহন বাড়িতে দুর্গা পুজোর সময় মেলা আর হাট মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। একবার ছোটদাদার বুদ্ধিতে চুপিচুপি দুজনের বাঁশের খাম ভেঙে জমানো টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম সেই মেলায়। জীবনে প্রথম সেদিন বায়োস্কোপ দেখেছি। দেখেছি বিড়ি কোম্পানির নাচ। ছেলেরাই মেয়ে সেজে বুক উঁচু উঁচু করে ঘুঙুর পায়ে নাচছে। নাচ দেখে নাড়ুর দোকানে গিয়ে দাদা দশ পয়সা দিয়ে একটা সাদা কাগজ কিনল। তারপর দোকানি সেটা জলে ভিজিয়ে দেখাল ফুটে উঠেছে দশ সংখ্যা, মানে দশটা নাড়ু প্রাপ্তি। নাড়ু খেতে খেতে আরও অনেক কিছু কিনব বলে আমরা মেলা ঘুরছিলাম। এক জায়গায় ডুগডুগির শব্দ। ভিড় ঠেলে ক্লাস থ্রি-র দাদা সামনে নিয়ে গিয়েছিল বুনুকে ম্যাজিক দেখাবে বলে। কিন্তু সে তো রক্তাক্ত কলিজা বের করা হাড় হিম ম্যাজিক?!

ম্যাজিক পার্টির একজন মাইকে চেঁচিয়ে বলছিল যে যা পারেন দিয়ে দিন। আমি ভয়ে কাঁদছি। দাদাও কাঁপতে কাঁপতে পয়সার থলেটা ছুঁড়ে দিয়ে আমার হাত ধরে সোজা দৌড়। বাড়ি পৌঁছেও কাঁপছিল দাদা।

সবকিছু শুনে মা এতটুকু বকা না দিয়ে বলেছিলেন দোষের শাস্তি ভগবান কীভাবে দেন দেখলি! তারপরেও দাদার সাথে দেখেছি পুতুল নাচ, পাব্লিসিটি। বাবা মা-ও রাতে ভাগবত পাঠ, যাত্রা, রামলীলা, কীর্তনে গেলে আমাকে নিয়ে যেতেন। রাতে বাবার কাঁধে চড়ে বাড়ি ফিরতাম। এখনও চোখে ভাসে রামলীলার সীতার নিজেকে আড়াল করে বিড়ি খাওয়া আর অভিনয় করতে করতে হ্যাজাকে পাম্প। আমার বাবা হাট কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজেই দোকানিদের থেকে মাশুল তুলতেন। আমরা ছোট থেকে দেখেছি ঝড় উঠলেই মা উঠোনে পিড়ি পেতে দিয়ে বলতেন, পবনঠাকুর বসো। সেটা যদি হাটবার বিকাল হত মা অস্থির হয়ে বলতে থাকতেন শান্ত হও পবনঠাকুর। ভগবান হাটটা নষ্ট করে দিও না। তবুও ঝড় হত। বৃষ্টি নামত। তখন মায়ের জন্য খুব কষ্ট হত। বাবা বাড়ি এসে লাভ-ক্ষতি কিছু না বলে পাঞ্জাবির পকেট থেকে ভেজা কাগজ শুদ্ধ আমার প্রিয় চিনির মাছ বার করে দিতেন। আমিও বড় চুল-দাড়িওয়ালা ফর্সা টুকটুকে বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়াতাম।

আমাদের বাড়িতে একটা কচুরিপানাতে ঢাকা পুকুর ছিল। পুকুরের চারিদিকে লঙ্কা জবা, গন্ধরাজ, টগর ফুল, ডুমুর, লেবু গাছে ঘেরা লুকোচুরির আস্তানা। মাছ, শামুক, ঝিনুক, ঢোঁড়া সাপ, ডাহুক এসব তো ছিলই, মাঝে মাঝে কাঁকড়া উঠে আসত। ব্যাঙের আর্তনাদ শুনে বুঝতাম সাপে ব্যাঙ ধরেছে, গা-টা কেমন ছম ছম করত। তবুও আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে কচুরিপানা সরিয়ে ব্যাঙাচি ধরতাম। কখনও বন্ধুরা মিলে পুতুল বিয়ের জল ভরতাম। পিছনে বাগানে যাবতীয় গাছ ছিল। পাড়ার অনেকেই আমাদের বাড়িটাকে বলত তপোবন। এক ধারে বাঁশ ঝোপ ছিল, বড়মা বলতেন সেটা নাকি ভূতপেত্নির আখরা। আমরাও দূর থেকে ভূতের ছায়া দেখেছি বহুবার। বড়মার পাশে শুয়ে সবরকম ভূতের চরিত্র সম্পর্কে জেনেছি। আর সেই বয়সেই শিখেছি ভরদুপুরে আর রাতে চুল খুলে না বেরতে।

আমাদের বিরাট উঠানে কাঠের তরোয়াল দিয়ে যাত্রাপালা থেকে শুরু দাড়িয়াবান্দা, মারবেল, ক্রিকেট, ডাংগুলি কোন খেলা না হত! অন্য পাড়ার দাদারাও খেলতে আসত। জাম্বুরা গাছের ডালে দোলনা ঝোলানো থাকত বারোমাস। গরমের দুপুরে স্কুল বন্ধ থাকলে রোজ গরুর গাড়ির পিছনে ঝুলে ঝুলে অনেক দূর চলে যেতাম। আরও একটা ভাললাগা ছিল। আমাদের উঠোনটা প্রতি বর্ষায় অন্তত একবার নদী হয়ে উঠত। তখন দাদারা বন্ধুদের নিয়ে কলাগাছের শরীর জুড়ে জুড়ে এক একটা আস্ত আদিম জলযান বানিয়ে ফেলত। আমিও চড়েছি ওই ভেলায়। কিন্তু উঠোনের জল কমে

গেলেও তিস্তার ডাক শোনা যেত স্পষ্ট। কতবার দল বেঁধে গিয়ে দাঁড়িয়েছি বানভাসি তিস্তার কাছে।

রান্নাবাটি খেলা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, মাছ ধরা আর বাড়ির বারান্দায় সবার মায়ের কাপড় জড়ো করে প্যান্ডেল বানিয়ে নাটক। স্কুলের টিফিন বেলায় চুটিয়ে আনন্দ, দিদিমণির কাছে নাচ শিখে নানা জায়গায় নাচতে যাওয়া, রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী, প্রজাতন্ত্র প্যারেড, অনুরোধের আসর, স্বাধীনতার প্রভাত ফেরি, মহালয়ার পিকনিক, পার্কে লুকানো বিকেল, জ্যোৎস্নার আনন্দ— সব নিয়ে দাদাদের প্রটোকলের মধ্যেই নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে চলেছিলাম বেশ। হঠাৎ প্রকৃতি একদিন বুঝিয়ে দিল আমি বড় হয়ে গেছি। মা পদে পদে শেখাচ্ছেন মেয়েদের কী কী করতে নেই। শেখাচ্ছেন তুলসী মঞ্চে লুট, নাটাই পুজো, সন্ধ্যা দেওয়া ইত্যাদি আদর্শ নারী হওয়ার মন্ত্র। তবুও মায়ের সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি আদরের ছলে অনেক কাকু জ্যেঠুর মন্দছোঁয়ার কষ্টটা। তবে সেই সময়ই আমাদের বাড়িতে আরএসএস-এর চারজন ভাল কাকু ভাড়া থাকতেন।

আমার সন্ধ্যার রেওয়াজের পর তাদের কাছেই তো শিখেছি দেশাত্মবোধের মহৎ সংগীত। শুনেছি ঋষি অরবিন্দের বাণী।

চার দাদার এক বোন আমি। তখন শিলিগুড়িকে আমার অন্য দেশ মনে হত। যে দেশ থেকে মাঝে মাঝে হিল জুতো আর কত যে রকমারি জিনিস নিয়ে আসত বড়দাদা। যখন নাইনে উঠলাম ঠিক সেই সময় সেজদাদার কোচবিহারের এক বন্ধু চাকরি পেয়ে জয়েন করল। সেজদা তাকেই দায়িত্ব দিল আমার অঙ্কমশায় হওয়ার। এদিকে বান্ধবীদের হাত দিয়ে টুকটাক প্রেমপত্র আসতে শুরু করেছিল। ছোটদাদার ভয়ে সেগুলি পড়া তো দূরের কথা সব স্যানিটারি প্যানে ঢুকে যেত। তবে অঙ্কমশায়ের অভিনব কায়দার চিঠিতে বেশ একটা মজা ছিল। একদিন সাহস করে অঙ্কমশায় আমার হাতও ধরে ফেলেছিল, আমিও কেন যেন হাতটা সরিয়ে নিতে পারিনি। কিন্তু ঠিক সে সময়ই ছোটদাদা এসে পড়েছিল। যার ফল ক্লাস টেনে উঠে শিক্ষক পাল্টে গেল, সে হাত ধরে আর স্বর্গে যাওয়া হল না।

কবে জানি স্কুলপর্বও পেরিয়ে গেলাম। একদিন বিকেলে ঘুম থেকে উঠে দেখি মেজদাদার সঙ্গে এসেছে ওর প্রিয় পুরনো বন্ধু, তাকে বাবা মা-ও খুব ভালবাসেন, আমার সঙ্গেও সম্পর্ক সহজ। মায়ের কাছে শুনলাম মেজদাদার উদ্যোগেই সেই বন্ধুর বিয়ের সম্বন্ধ নাকি পাকা হয়ে গিয়েছে, দাদার অফিসের আশপাশেই পাত্রীর বাড়ি, দুপক্ষের অভিভাবকরাও রাজি। অথচ সেবারই যাওয়ার আগে আমায় একা পেয়ে হঠাৎ সেই বন্ধু বলে বসল, আমি কিন্তু তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি। ভেতরটা কেঁপে উঠলেও আমার মাথায় কিছু ঢুকল না।

ধন্দ অবশ্য নাটকীয়ভাবে কেটেছিল তার আট-দশদিন পর। রাতে চুল বাঁধছিলাম, মেজদা ঘরে ঢুকে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, পড়ে দ্যাখ। ভীষণ ভয়ে ভয়ে খামটা খুললাম, দুরু দুরু বুকে দেখি, এ তো একটা চিঠি! শুরুটা দেখে অবাক হলাম, এ চিঠি তো আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয়! তবে? পড়তে শুরু করলাম—

সুজনেষু নন্দা, আপনার সাথে আমার বিয়েটা হবে না। আমি চাকরি পাওয়ার পর থেকেই মা বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু প্রদীপের বোন লক্ষ্মীকে আমি ভালবাসি। প্রদীপ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, ও ব্যাপারটা কীভাবে নেবে তাই ভেবে আজ পর্যন্ত বলতে পারিনি। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন। আমি কৃতজ্ঞ থাকব। ইতি- কুণাল নন্দী, মেখলিগঞ্জ, ১২/০৫/১৯৮৮

তিস্তাপারের কন্যা আমি। আজ মনযোগী অনুভবে দেখতে পাই— সময় কীভাবে বাল্য কৈশোর যৌবনের এক একটা অধ্যায়কে ঋতু থেকে ঋতুতে এগিয়ে নিয়ে গেছে বহুদূর। কত পথ পাল্টেছে শুধু মুহূর্তগুলো থেকে গেছে হৃদয়স্পর্শী অথচ গোপন। যা আজ আড়মোড়া ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি কানে শুনতে পারছি মেয়েবেলার শেষ দিনের নির্মম এক নাটকীয় দৃশ্যের করুণ সংলাপ। একমুঠো চাল আর ইঁদুরের গর্তের মাটি মায়ের কাপড়ের আঁচলে দিয়ে— মা আমি তোমার সব ঋণ শোধ করে দিয়ে যাচ্ছি। সত্যি কি মায়ের ঋণ শোধ করতে পারে কেউ? নাকি এ নিয়ম চেনা মেয়েবেলার যবনিকা পতনের এক নির্দেশ?

এর দু'বছর পর একদিন মায়ের আঁচলে সেই মেয়েবেলাকে গচ্ছিত রেখে আমার মিত্র থেকে নন্দী যাত্রা।

লক্ষ্মী নন্দী

শারদীয়

এখন ডুয়ার্স

বিশেষ অক্টোবর সংখ্যা ২০১৮

কভার স্টোরি

দেড়শ বছরের জল শহর

বন্যার পর পঞ্চাশ বছরে
কতটুকু বদলেছে জলপাইগুড়ি?

এবার জলপাইগুড়ির দুর্গাপুজো

বিশেষ রচনা

ফাটাপুকুরের যাযাবর বস্তি
উমেশ শর্মা

বড় গল্প

ছায়ারা জন্ম নেয়
সাগরিকা রায়

নয়া পঞ্চায়েত নবগ্রাম
মাল

ইকো পর্যটন

উত্তরের এক ডজন
নতুন ঠিকানা

সেই সঙ্গে অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ এবং

'শ্রীমতি ডুয়ার্স'-এর
বিশেষ সংযোজন

দাম মাত্র ২০টাকা।

বেরোবে সেপ্টেম্বরের শেষে।

ধারাবাহিক কাহিনি। ৩

মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

স্কেচ দেবাশিস সাহা

বাইরে বাইরে বনবাদাড়ে এলোথেলো কাদামাখা মেয়ে তোর্সার বাঁধে নতুন ফেলা বড় বড় বোল্ডারের উপর ধূলোমাখা জামা সবে ছেড়ে কলতলায় পা দুটো ধুয়ে নিয়েছে একটুক্ষণ আগে। এক ছুট্টে, ঠাম্মার খাটে। কানে আসে সোহাগিনীর গজগজ কথন... 'ঐ হল'। মাথায় উঠল লেখাপড়া! ততক্ষণে গলার সুর উঠেছে জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর... কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া মহিমা অপার...

আর ওটা শেষ হলেই, লাল শালুতে মোড়া বই বেরিয়ে আসে

'নৃপতির প্রিয়তমা ভানু পাটেশ্বরী।
ভট্টাচার্য আগে কথা কহিলা সাদরি।।
পাণিণির বর্ণক্রম গ্রন্থনে লিখিবা।
মহেশের কৃত কলাপের ক্রম দিবা।।'

আহা! ঠাম্মার পড়তে পড়তে চোখ বুজে আসে, আবার গল্প করে, বুঝিয়ে দেয় রাজ্যশাসন সূচনা পর্ব, রাজমহিষীদের উদ্যম, আন্তরিকতার শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসা। আর অদ্ভুত সাহিত্য সৃষ্টির প্রবণতার কথা। এসব শুনতে শুনতে মহারাণী হয়ে যেত সেই সময় সত্যিকারের পাটরাণী। রাজ সিংহাসনে বসে আছে যেন সে। দূরের চোখে দেখত ওর মাথার মুকুটের রত্নগুলো ঝকঝকে। কিন্তু পরিষ্কার করে নিজের মুখখানা মেলাতে পারত না। ...সে মুখ হয়ে উঠত সোহাগিনীর। ...তখন্য কানে আসছে সেই নারী কথার, নারী যাপনের, নারী শিল্প সূচনার কলা সংগীত। চোখ খুলেই দেখত মা দাঁড়িয়ে। সোহাগিনীর বড় বড় চোখ ঠাম্মার উঁচু খাট থেকে মহারাণীকে লাফিয়ে নামতে বাধ্য করত। ততক্ষণে শালুতে মুড়িয়ে সে সব বইপত্র আবার উঠে গেছে কুলুঙ্গিতে।

এই কুলুঙ্গি আর বিড়াল আটকানোর সিকে ছাদের উপর থেকে যা ঝুলত সেখানে খাদ্যখানা রান্না করা অনেক কিছুই ঝুলনো থাকত। এই কুলুঙ্গি আর সিকে মহারাণীর জীবনে রক্ত মাংসের মত জড়িয়ে ধরেছে।

ঠাকুমার সে শূন্য শূন্য ভুবন কখনও শূন্য হল না মহারাণীর। কুমড়োর গাড়ির ফিটন... সিন্ডেরেলার গাড়ি— ওতে চেপে রাণীর স্কুলে ঠাম্মার স্কুল যাওয়া চোখে দেখতেই বড় হয়ে গেল কখন!

***

সেদিন 'যেমন খুশি সাজ' এই ইভেন্টে মহারাণী কলেজে একখানা পুরস্কার পেয়ে গেল। শনের দড়ির মত উইগ পরে ঠাম্মা সেজেছিল আর লাল শালুতে মোড়ানো সে বইখানা ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত'। বৃন্দাবন দাসের। সবাই তো বাহা বাহা! এ বৈষ্ণব বাড়ির মেয়ের আনন্দ দেখে কে। স্পোর্টসে অন্য খেলাগুলোয় তো লবডঙ্কা, বন্ধুরা লংজাম্প, হাইজাম্পে পুরস্কারে পুরস্কার। আর রাণী... বন্ধুদের সম্রাজ্ঞী অভিনয়ে, সুরেলা বাঁশির স্বরে এক নম্বর। ঠাম্মার গল্পকথা কখন যেন জীবনে জড়িয়ে গেল। চলে যেত সেই ১৮৫৮ সালে, যখন এ রাজবাড়ি রাজবাড়ি হয়নি। সেই গুঞ্জবাড়ি পেরনো ছনের, মাটির, টিনের কিংবা ধারার বেড়ায় আলপনা কাটা রাজবাড়ির গল্পে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকের সেই দোরবুপান্না আর ভানুমতীর রাজবাড়ির সে গুহার ছবি চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। সে গল্প বাবার কাছে শুনতে শুনতে সে-ই কখন জগরুর হাত ধরে ভানুমতী হয়ে যায়। ওর স্বাধীন রাজ্য রাজনগরে ও যেন স্বাধীন রাজকুমারী। পরম বন্ধুত্ব পর্ব আগে ছিল ঠাকুমা সেই কল্পনার সিনডেরেলা আর রাজীব মিত্রকে মনে হত না দেখা গল্পকথার সেই বহু আগের রাজনগরের রূপকার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আসত জলবৃত্তের মত স্টেট কিংডম এম্পেয়ার সেই সাম্রাজ্যের কথা যেটা গড়ে উঠেছিল মহারাজ নরনারায়ণ ও শুক্ল ধ্বজ বা সমর সিংহ অথবা চিলা রায়ের সময়। সে সাম্রাজ্যের রাজেন্দ্রানী, মহারাণী বা রাজকুমারীরা আমাদের একালের রাণী-মহারাণী পোশাকী নামের সম্রাজ্ঞীকে জড়িয়ে থাকে, আর স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। সে স্বপ্নে ঘুরে ঘুরে আসে নদী কথা, তোর্সা পাড়ের বৃত্তান্ত। চরের ধারের মানুষগুলোর বাড়ি, সেখানে বয়ে যাওয়া কলস্রোতের ধারে গড়ে তোলা উঠোনে সন্ধেবেলা প্রদীপ জ্বলে তুলসী মঞ্চে, বর্ষার সময়টুকু পেরিয়ে অন্য সময় ওরা তো চরের রাজা মহারাজা সব। ওখান থেকে ভেসে আসে ট্রানজিস্টারে চটুল পুরনো হিন্দি গান কিংবা পুরনো উচ্চাঙ্গের আধুনিক বাংলা। ওদের পাড়ের ইতিহাস এক অন্য রাজ্যের সূচনা করে যেন। আমাদের মহারাণী সেই শিশুকাল থেকে সেই তোর্সা বাঁধের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিলিয়ে নিয়েছে, এক আধদিন প্রবাস থেকে ঠাকুরদা বা জ্যেঠু সম্পর্কীয় কোনও পরিবার বেড়াতে এলে আয়োজন করে দু'-একজন বড় দিদির হাত ধরে বাঁধ ধরে হেঁটে যাওয়া। হাঁটতে হাঁটতে লাল কৃষ্ণচূড়া কিংবা বর্ষার জারুল বা বেগুনি রঙা অথবা লালচে রং আর সবুজ পেরোতে পেরোতে পৌঁছে যাওয়া 'রাণীর বাগান'। কেমন রহস্য আর ধোঁয়াশার ভেতর দেখতে পেত 'কেশবাশ্রম' লেখা অস্পষ্ট লেখা ফলক।

বাঁধের নিচে দু'পাড়েই বসতি। চরুয়া বসতিরা পাড় ভাঙে আর বদলে যায়। এই পাড় থেকে অন্য পাড়ে ভাসিয়ে নেয় বড় বড় গাছ, গবাদি পশু মাথা তুলে বাঁচার তীব্র আকুতিতে পেরিয়ে যায় ঘোলা জল স্রোত। কী টান সে জলের! বাঁধের উপর শহরের মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। কেউ বা গাছের লম্বা সরু ডাল পাড়ের নরম মাটিতে পুঁতে দিয়ে জলের বেড়ে ওঠার প্রহর গোনে। এক এক পল যায়, পোঁতা কাঠি ডুবতে থাকে জলের নিচে, তারপর একসময় অদৃশ্য হয়। মহারাণী আর বন্ধুরা স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে জলের ফুঁসে ওঠা দেখে। এ তোর্সাকে মনে হয় প্রতিদিনের সঙ্গী; প্রতিদিনের জড়িয়ে থাকা মানুষ, যারা জল বাড়ছে বলে শাড়ি, পাজামা, লুঙ্গি গুটিয়ে ছাতা মাথায় জল দেখতে আসছে, তাদেরকেই মহারাণীর মনে হত সে সময় অনাত্মীয়, কেবল বর্ষার অতিথি। ভয় আর কৌতূহলে সব জুটেছে এসে অন্য পাড়া থেকে ওদের পাড়ায়। ওদের নিজস্ব বাঁধে। আসলে তখন নিজের আর অপর বোধগুলো তো অন্যরকম। চরুয়া বসতির লোকজনকে মনে হত ওরা তো আমার ঘরের। ওচারী, তিত্তিরি, সরলা, মনো, মাণিক, অমল, কমল ওদের সবাইকে মনে হত বাড়ির মানুষ। জল বাড়লেই মহারাণীদের বারান্দা ভরে যেত যে, ওরা জায়গা পেত অকাতরে ওদের যৌথ বাড়ির বারান্দায়। সোহাগিনীর পুরনো শাড়ি, কিংবা রান্নাঘরের ঢালা খিচুড়ির পাত্রের গন্ধ বর্ষার বাদল বাতাসে ম ম করত। মহারাণীর তখন তোর্সার সে ভাসিয়ে নেওয়া কচুরিপানার সারিগুলোয় লাফিয়ে পড়তে সাধ হত। সেই বেগুনি ফুলের থোকাগুলো বামাল ভাসতে ভাসতে চলেছে, বাতাসে

দুলতে দুলতেও। ও যে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাই ভুলে যেত। মনে হত সেই উত্তাল ঘোলা স্রোতে ও-ও চলেছে দূরে আরও দূরে। বিকেল যে পড়ে এল একথা জানাবে কে! সূর্য তো বহুদিন মুখ দেখায়নি। মা এসে ডেকে নিয়ে যেত। সোহাগিনী রাজীবের সংসারে কারো একা হবার উপায় নেই। শুধু দুপুরগুলো চুরি করে বন বাদাড়, এদিক ওদিক পাতা লতার সংসার। রাজনগরের রাজধানী আর রাজপরিবারের গল্প শোনাত রাজীব আর কল্পজগতে ঢুকে যেত বইয়ে পড়া নীলকমল লালকমল আর মহারাজা রাজপুতদের কাহিনির ছবি।

মহারাণীর তখন কতই বা বয়স! সাত বা আট, মহানগরী কলকাতা থেকে বেড়াতে এলেন জেঠু জেঠিমা আর তাদের দুই মেয়ে। হই হই রই রই। ঘর নাড়া। এধার ওধার হওয়া। ভাল ঘর তাদের ছাড়তে হল। বাবা মার কাছ থেকে খানিকটা ছাড় পাওয়া। এবার সেই কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা দুই বোন পম্পামণি, শম্পামণি দুজনকে নিয়ে আনন্দের তোলপাড় রাণীর। এত কাছ থেকে প্রায় সমবয়সী দিদিদের সঙ্গে বিশেষ করে মহানগরীর বাসিন্দা, তাদের কদরই অন্যরকম। বর্ষা নয়, শরতের সময় স্কুলও ছুটি পড়েছে, হাত ধরাধরি গুটি গুটি বিকেল বিকেল বাড়ির এক মাসিকে সঙ্গে নিয়ে বাঁধ ধরে হাঁটতে থাকা। পর পর সরে সরে যায় জারুল, শিমুল, কলকে ফুলের বড় বড় গাছ। বাঁধের গায়ে লাগান চরের দিকের মাটির বাড়িগুলো, অন্যধারে পাকা, কোঠাবাড়ি আর সংলগ্ন রাস্তা। এতদূর হাঁটতে হাঁটতে পেরোয়নি কখনও। মাসি হাত তুলে দেখাল ওদের। —ওই যে রাস্তাটা দূরে চলে গেছে ডান হাতি, ওটা পাটাকুড়ার রাস্তা পেরিয়ে এসেছি। অল্প ঝিরঝিরে রোদ গায়ে জড়িয়ে আছে। পম্পামণি দিদি, আর শম্পামণি দু' বোন বেশ মজা নিচ্ছে জড়িয়ে ধরছে মহারাণীকে। আরও অনেকটা পথ পেরতে হল, এবার চলে এসেছে 'রাণীর বাগান'। রাণীর বাগান নাম হল কেন পম্পামণি দিদি জিজ্ঞেস করার আগেই মাসিই ফরফরিয়ে বলতে থাকল, '...নাও বাবা, সন্ধের আগেই সব দেখেটেখে নাও। ঐ বিকেল পর্যন্ত, তারপর কিন্তু তেনারা (কপালে হাত ঠেকায় মাসি) বেরিয়ে পড়েন। এই যে দেখছ ফুলগাছ, প্রজাপতি প্রজাপতি দেখতে ফুলগুলো সবক'টা কিন্তু সন্ধে লাগতেই প্রাণ পেয়ে যাবে। ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশায় বেরিয়ে পড়বেন রাজপরিবারের স্মৃতি মন্দির থেকে মহা মহা রাজারা। নরনারায়ণ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ আর তাঁদের রাণীরা। নূপুরের শব্দও শোনা যায়, তাই তো রাণীমার তৈরি বাগান বলে আমরা বলি 'রাণীর বাগান', বিহ্বল তিন কিশোরী তাকিয়ে থাকে মাঝখানে কাচঘেরা সমাধির দিকে। চিতাভস্ম নিয়ে রাজপরিবারের বিভিন্ন জনের স্মৃতি ফলক। কেশবাশ্রম লেখা কেন, এর মানে কী জিজ্ঞেস করেছিল রাণী বাবাকে। জেনেছিল এ বাগান তৈরি রক্ষণাবেক্ষণ সবই মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে। তাই সুনীতি দেবীর নাম তো এতে জড়িয়ে থাকবেই। মহারাণী সুনীতি দেবীর এক বিরাট ফটোগ্রাফ বাঁধাই করা মহারাণীর জেঠুর ঘরে। বাবা তাঁকে প্রণাম করা শিখিয়েছিলেন, রাণী সেই ছোট্টবেলা থেকে প্রণাম করে। বাবা বলেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যেমন প্রণাম করবে, এই মহীয়সীকেও প্রতিদিন প্রণাম করবে। ভুলে যাবে না, ইনিই সেই মহান পণ্ডিত ব্রাহ্ম ধর্মের পথ প্রদর্শক আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা। যাঁর পদার্পনে রাজনগর কত বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছে, নিজস্ব ছায়ায় গড়ে নিয়েছে মানুষদের। পম্পামণি, শম্পামণি, মহারাণীও সেদিন বড় বড় চোখে রাজীব মিত্রের কথা শুনেছিল।

যখন কোনওখানেই নারীর এগিয়ে থাকা, শিক্ষার অধিকারের পৃথক যুক্তি, কুসংস্কার ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। সেই সময়কার খানিক ধোঁয়াশা কল্পনা ইতিহাস হয়ে ওদের মন থেকে মনে ছড়িয়ে পড়েছিল। চোখ বুজলেই সাদা পোশাকের সুন্দরী সুনীতিদেবীর চেহারা তারা কল্পনায় দেখেছিল। সেই রাণীর বাগানে সাদা পোশাকের ফুলেল লেস কভার, মাথায় হালকা উত্তরীয় লাগানো মুকুট আর উড়নী ভেসে বেড়াচ্ছিল সবুজ ঘাসের পরতে পরতে। ওরা বহুক্ষণ বিকেলটায় ফুলপাতা ঘাসে খেলতে খেলতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। মাসির তাড়ায় খেয়াল হয়েছিল, সন্ধে লাগবে একটু পরই। ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠবে তো! পম্পামণির অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মহারাণী বলেছিল, —তোমরা রাজনগরের মহারাণীর সুনীতিদেবীর এত কাজের কথা বিশ্বাস করছ না তো? বেশ, কাল ওনার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে তোমাদের নিয়ে যাব।

মহারাণী সুনীতি দেবীর এক বিরাট ফটোগ্রাফ বাঁধাই করা মহারাণীর জেঠুর ঘরে। বাবা তাঁকে প্রণাম করা শিখিয়েছিলেন, রাণী সেই ছোট্টবেলা থেকে প্রণাম করে। বাবা বলেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যেমন প্রণাম করবে, এই মহীয়সীকেও প্রতিদিন প্রণাম করবে। ভুলে যাবে না, ইনিই সেই মহান পণ্ডিত ব্রাহ্ম ধর্মের পথ প্রদর্শক আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা।

মাকেও যেতে হবে কিন্তু! —জান, আমার ঠাকুমা সিনডেরেলার মত কুমড়োর গাড়ি চেপে ঘোড়ায় টানা ফিটনে স্কুল যেত? আমায় ঠাম্মা নিজে বলেছেন। সেখানে আমার মা, মাসি সবাই পড়েছেন, আমিও পড়ছি, ...তোমাদের দেখাব সেই অবিশ্বাস্য ছবি। আকাশের রং বদলের ছবি মাথার উপর ঝুলে থাকা জারুল ফুল, বকুল গাছের পাতা, আমলকীর ঝিরঝিরে সবুজ পাতাগুলোকে আর বিকেলে মাঠের মাঝখানে এসে বসে বেলে হাঁস, বক জাতীয় পাখিরা। আর রাজার মত ঈগল অথবা চিল— ডানা মেলে দেওয়া। এসব তো তোমরা দেখোইনি!

—হুঁ তা বটে। সত্যি, বিলিভ মি, এমন প্রিন্সেস, কুইনের বাড়ি দেখব, স্কুল দেখব; উৎসাহিত হয়ে পড়ছি মনে মনে।

সে রাত ওদের বিনিদ্রই কেটেছিল। রাতের নিস্তব্ধতায় উঠে আসছিল হরিধ্বনি। ...হরি হরি বোল... বোল হরি... হরি বোল। ...নিস্তব্ধতা খান খান করে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যাওয়া... এই ধ্বনি মহারাণী সহ্য করতে পারে না। কেমন অসহায় মৃত্যু ভয়ঙ্কর। কান বন্ধ করে রাখে ভয়ে। আরও ছোট যখন, মা বাবার মাঝখানে শুয়ে সোহাগিনীর বুকের গন্ধে ডুবে যেতে যেতে আর নিঃশ্বাসের শব্দের ভিতর সে হরিধ্বনিকে চাপা দিয়ে রাখতে চেয়েছে, তবু সে বার বার ঘুরে আসে। আর দূরের শেয়ালের ডাক। কিন্তু সে রাত ওরা তিনজন। ...সবাই ওরা সবাইকে জড়িয়ে রেখেছিল। রাজনগরের রাজধানীর গল্প আর মহারাণী সুনীতিদেবীর পোশাক পরিচ্ছদের গল্প শুনছিল ওরা। আর রাতের অন্ধকার চিরে ওদের মুগ্ধ চোখগুলো অনুভবে ছুঁয়ে থাকে মহারাণী। খুব একচোট ভাললাগা বোধ জড়িয়ে যায় আরও একবার জন্মভূমির টানে। সেই স্বাধীন রাজার স্বাধীন মাটির গর্বে দুলে দুলে উঠেছিল, ঘুমে কখন যে চোখের পাতা বন্ধ হয়েছিল নিজেরাই জানে না। সে সব মহারাণী সম্রাজ্ঞীর ভরে থাকা কিশোর কিশোরী স্বপ্ন। পরদিনের রোমাঞ্চ বুকে নিয়ে ওরা স্বপ্ন দেখেছিল। রাজনগরীর প্রাসাদ প্রকোষ্ঠে কিংবা স্কুল চত্বরে ওরা কাল পৌঁছবেই। মহারাণীর মাথার ভিতর আবার খুঁচিয়ে উজিয়ে এসেছে ভাবনাগুলো, স্কুল গেট খুলে দেবে তো গার্ডবাবু নরসিংহ... নিশ্চয়ই দেবে। ও তো ছোটদের খুব ভালবাসে, নিজের স্কুল দেখাতে দেবে না? সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভিতর ঘুরনীর মতন সুখ। আরে! আগামীকাল বন্ধ হল তো কী হল!! মহারাণীদের এন.সি.সি ক্লাস আছে যে! দিদিমণি সুরবালাদি নিশ্চয়ই আসবেন। বাকি মেয়েরাও আসবে। মহারাণীর সেই প্যারেড, এন.সি.সি.-র ক্লাস পম্পামণি, শম্পামণি নিশ্চয়ই দেখবে। খুব আনন্দে কোল বালিশটা চেপে ধরে আরও একটু আবেশের ঘুম ঘুমিয়েছিল।

৬

অরুণ চায়ের দোকানে আজ একেবারেই যেতে চায়নি। মলয় প্রবীরদের পাল্লায় পড়ে যেতে হল। কলেজটায় লেগে আছে সেই কবে থেকে। স্কুলে পড়ার সময়ই মাঝে মাঝেই ইউনিয়ন নিয়ে এসেছে ঠিক কলেজ নির্বাচনের আগে আগে। আসলে সাম্যবাদ, মৈত্রী, একতার কথা বলত তো ওদের পার্টির দাদারা, এখনও বলে। তবু সূক্ষ্ম কতগুলো কেটে যাওয়া দাগ বা ক্ষতের দাগ মিলিয়ে যায় না। খুঁচিয়ে তোলে, আসলে তো অরুণ সংস্কৃতির মানুষ। আর সেই কাজ করতে গিয়েই তো মানুষ ভালবাসা। হাতে হাতে ধরে থাকা রং। মিশিয়ে তোলা মঞ্চনাটক, পথ নাটকে। আর অদ্ভুত আকর্ষণীয় সরলতা আর কথা। শব্দের প্রক্ষেপণে এক অদ্ভুত মানুষ। গেরুয়া রঙা কিংবা গাঢ় সবুজ পাঞ্জাবীতে ওকে বাস্তবিকই অন্যরকম দেখায়, সেটা বুঝতে বেশ ক'বছর সময় লেগে গেল। আয়নায় তো কখনও দাঁড়ায়নি, মা-ছেলের সংসার। মা-র তো কখনওই ড্রেসিং টেবলের দরকার ছিল না। ছেলেরই বা কোন প্রয়োজন! সারাদিন পড়াশুনো, বই মুখে নিয়ে বসে থাকা। এই যে গোগ্রাসে বইয়ের অক্ষর গিলে নেওয়া এরও শুরু বোধহয় মার হাত ধরেই। মার অর্ধেক পড়ে ফেলে রাখা বইগুলো শেষ করতে একটা রাতই ওর পক্ষে যথেষ্ট। এভাবেই পথের দাবী থেকে মাদার, বিভূতিভূষণ, মাণিক শেষ। তারপর ভেঙে ভেঙে পড়া, লিখে রাখা, পেনের দাগে ইম্পর্ট্যান্ট অংশগুলো ছবির মত মনে গেঁথে যাওয়া, সেই সঙ্গে মার শিখিয়ে তোলা সুকান্ত সমগ্রের কবিতার লাইন কিংবা রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী অথবা নজরুলের বিদ্রোহী দুরন্ত গতিতে গভীরে চলে গেছে। উঠে এসেছে বিগত কমিউনিজম-এর ইতিহাস। মার্কস, এঙ্গেলসের জীবনী পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, এই তো সঠিক পথ। মানুষকে চিনে নেওয়ার, আন্দোলনের সঠিক পথ সন্ধান। তাহলে এতদিনের ইতিহাস কী বলে! রাজনগরের ইতিহাস কী বলে! এ কি একনায়কতন্ত্রের ইতিহাস?

(ক্রমশ)

ধারাবাহিক কাহিনি

অরণ্য মিত্র

লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর

১

শালগুড়িতে আজ হাটবার। এখন বেলা দুটো। একটু পরেই হাট জমে উঠতে শুরু করবে। রাধু বর্মনের গালামালের দোকানটা বাস স্টপের ঠিক সামনে। দোকানে পাওয়া যায় না এমন জিনিস খুব কম আছে। সাতজন কর্মচারি আর একজন ম্যানেজার মিলে হাটবারের দিনটায় শ্বাস ফেলার ফুরসৎ পায় না। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতেও বিক্রি বেশ ভালো। রাধু বর্মন এ দোকান পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে। সংসারে পাঁচ দিদির পর রাধু বর্মনের জন্ম। আদরে-যত্নে বড় হয়েছেন। কিন্তু লেখাপড়ায় খুব একটা আগ্রহ ছিল না রাধু বর্মনের। তাঁর ভালো লাগত বাবার সঙ্গে দোকানে বসে ব্যবসা দেখতে। বছর দশেক আগে রাধু বর্মনের বাবা অগুরু বর্মন যখন স্বর্গে গেলেন তখন রাধু বর্মন বিয়ে-থা করে ঘোরতর সংসারি। পিঠাপিঠি দুই ছেলে স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ছে। দুটি ছেলের আগে তিনটি মেয়েরও বাবা হয়েছিলেন রাধু বর্মন। মেজটি অকালে মারা যায়। বাকি দুটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

বড় ছেলেটি এখন ফৌজি। বউ-ছেলে নিয়ে সে আছে নাগপুরে। ছোটটি শালগুড়িতেই থাকে। রাজনীতি করে। তিন বছর আগে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন রাধু বর্মন। এমএ পাস করা বউমা এসে বাড়ির সব কিছু বদলে দিয়েছে। রাধু বর্মনের বউ এখন ফ্রিজ থেকে ভাত বের করে মাইক্রো আভেনে গরম করে খেতে পারে। এসব ছোট বউমার কাজ।

শ্রাবণ ফুরিয়ে গেছে। এবার বৃষ্টি খুব একটা হয় নি। সকাল থেকেই চড়া রোদ্দুর। ম্যানেজার হরিপদবাবু দু-জন কাস্টমারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করছেন। রাধু বর্মন দোকানের কোণে ছোট চৌকিতে ক্যাশ বাক্সের পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছিলেন। এবার তিনি ম্যানেজারের গলা শুনতে পেলেন— তিনশো নব্বই করে দিয়ে দিলাম, বুঝলেন। বলছে, মাল ভালো হলে পরে অনেক বেশি করে নেবে!'

রাধু কর্মকারে হোলসেল ব্যবসা আছে। স্বর্ণচাঁপা ঘি। গ্যালাক্সি নুডুলস। সুপার মুন কাপড় কাচার সাবান। হনুমান ছাতু। ম্যানেজার এতক্ষণ ধরে লোক দুটোর সঙ্গে ঘি-এর দাম নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছিলেন।

রাধু বর্মন একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, কতটা নেবে?

দু-টিন।

দিয়ে দাও। লাভ অবশ্য কিছু থাকবে না। তা পরে যখন বেশি নেবেন বলছেন তখন দিয়ে দাও। তবে স্বর্ণচাঁপা ঘি একবার যে কাস্টমার খাবে সে আবার চাইবে।

ম্যানেজার মাথা দুলিয়ে বললেন, তা তো খাবেই।

দু-টিন কি দোকানে হবে? রাধু বর্মন এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘি-এর স্টক বোঝার চেষ্টা করলেন। পাশ থেকে একজন কর্মচারি জানিয়ে দিল যে, দোকানে ঘি বাড়ন্ত। গোডাউন থেকে আনতে হবে।

রাধু বর্মনের বাড়িতেই তাঁর হোলসেল গোডাউন। হিসেবপত্র সব বউমা সামলায়। ছোট ছেলেটার ব্যবসায়ে মন নেই। তাঁর ইচ্ছে পঞ্চায়েত প্রধান হওয়া। গালামালের ব্যবসাটা বোধহয় ভবিষ্যতে বউমাকেই সামলাতে হবে।

রবিকে পাঠিয়ে দাও। রাধু বর্মন আবার দেয়ালে হেলান দিলেন। রবি এই দোকানের সব চাইতে নতুন কর্মচারি। বছর দেড়েক হল এসেছে। দোকানেই থাকে। রাধু বর্মন শুনেছেন যে তাঁর বাড়ি মাথাভাঙ্গায়। কিন্তু এই দেড় বছরে একবারও সে বাড়িতে যায় নি। জিগ্যেস করলে বলেছে, বাড়িতে কেউ নেই। গিয়ে কী হবে?

রবি এক গোছা বস্তা পাটের দড়ি দিয়ে বাঁধছিল। ম্যানেজারবাবু বললেন, শুনলি তো? যা! দু-টিন ঘি নিয়ে আয়।

দোকানের পাশে একটা ভ্যান রিক্সা রাখা থাকে। রবি সেটা নিয়ে রাধু বর্মনের বাড়ির দিকে রওনা দিল। গোডাউন থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসার কাজটা রবিই করে। ছেলেটার বয়স বেশি নয়। বেশ চটপটে। চেহারাটাও ভালো। পড়াশুনো তেমন করে নি বলে ভালো কাজ জোটাতে পারে নি। অবশ্য রাধু বর্মনের দোকানে কাজ করতে পেরে সে বেশ সুখি।

ঘি-এর কাস্টমার দু-জন বলে গেল যে তাঁরা ফেরার সময় ঘি নিয়ে যাবে। টাকা পয়সা মিটিয়ে দিল। ভ্যান রিক্সা চালিয়ে গেলে রাধু বর্মনের বাড়ি হাট থেকে খুব জোর পনের মিনিটের রাস্তা। কিন্তু ঘণ্টা খানেক পর হাট যখন জমে উঠতে শুরু করেছে, তখনও রবি ঘি নিয়ে ফিরে এল না। রাধু বর্মনের ম্যানেজার তিনবার ফোন করলেন মালিকের বাড়িতে। তিনবারই মালিকের ছোট ছেলের বউ জানিয়ে দিল যে রবি এসে পাঁচ মিনিটও থাকে নি। ঝপাঝপ ঘি-এর টিন গোডাউন থেকে বের করে রিক্সায় চাপিয়ে চলে গেছে।

সন্ধে সাতটা নাগাদ ঘি-এর কাস্টমার মাল ডেলিভারি নেওয়ার জন্য দোকানের সামনে আসতেই রাধু বর্মন চিন্তিত স্বরে ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার কী হবে? রবি তো এখনও ফেরে নি। গেল কোথায়?

কাস্টমার দু-জন হাট থেকে আরো অনেক কিছু কিনেছিল। ছোট্ট একটা ট্রাক ছিল তাঁদের সঙ্গে। ড্রাইভারের সঙ্গে সেই ট্রাকে চেপে ম্যানেজার এবার নিজেই গেলেন গোডাউন থেকে ঘি আনতে। কাস্টমার দু-জনকে চা-সিঙারা খাইয়ে শান্ত রাখলেন রাধু বর্মন। ম্যানেজার ঘি নিয়ে ফিরে এসে বলল, রাস্তায় কোথাও রবিকে দেখলাম না কিন্তু। ঘি নিয়ে পালিয়ে গেল না তো।

কথাটা রাধু বর্মন মনে মনে উড়িয়ে দিলেন। দু-তিন টিন ঘি নিয়ে ভেগে পড়ার মত ছেলে রবি নয়। গোলমাল কিছু একটা হয়েছে।

২

রাজনীতি করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনোজের রাত হয়ে যায়। অবশ্যি রাত বলতে এগারটা। কিন্তু শালগুড়ির মত ডুয়ার্সের এই পাহাড়-জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে রাত এগারটা অনেক রাত্তির। রাস্তাঘাটে পথবাতি নেই। নিকষ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মনোজ মোটর বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়িটা তাঁদের বেশ বড়। দশ কাঠা জমির ওপর। পেছনের জমি ঢালু হতে হতে একটা খাদের মধ্যে নেমে গেছে। সেটা নদী খাত। ঢালু জমিতে বাবা চা বাগান করেছে বউ-এর পরামর্শে।

এমএ পাস করা বউকে নিয়ে মনোজের গর্বের শেষ নেই। বউ তাঁর দেখতে শুনতে বেশ ভালো।

আধুনিক ব্যাপার স্যাপার ভালো জানে। মোবাইলে অনেক কিছু করতে পারে। কম্পিউটরও শিখেছে। মনোজের শ্বশুর প্রাইমারি স্কুলের টিচার। রিয়া তাঁর একমাত্র সন্তান। গোটা শালগুড়িতে রিয়া রীতিমত জনপ্রিয়। ব্লক সভাপতি প্রায়ই মনোজকে বলেন, ভাগ্য করে একটা বউ পেয়েছিস মনোজ! তোদের বাড়িটাই বদলে গেছে।

বাড়ির বাইরে উঠোনে আলো জ্বলছিল। মোটর বাইকটা দাঁড় করিয়ে মনোজ লক্ষ্য করল বাবার ঘরেও আলো জ্বলছে। মনোজ এক সেকেন্ড থমকে দাঁড়াল। বাবা দশটার মধ্যেই শুয়ে পড়ে। পার্টি অফিস থেকে বের হওয়ার পর মনোজ একটু হুইস্কি খেয়েছিল। অল্পস্বল্প মদ খেলে রিয়া আপত্তি করে না। তবে বাংলা মদ খাওয়া একদম চলবে না। হুইস্কি খাওয়ার পর একটা মিঠে পাতার পানও খেয়েছে মনোজ। কিন্তু বাবার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। রিয়ার সাফ নির্দেশ আছে নেশা করে বাবার সামনে যাওয়া চলবে না। বাবা যদি এখন মনোজকে ডাকে তবে সমস্যা হবে।

কিন্তু সে সব কিছু ঘটল না। বাইকের শব্দ পেয়ে রিয়া ভেতরে যাওয়ার গেট খুলে দিয়ে বলল, 'বাবা জেগে আছেন। একটা ব্যাপার ঘটেছে আজকে।'

'ব্যাপার?'

'হুঁ। রবিকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'রবি?'

'দোকানের কর্মচারি।'

'ও হ্যাঁ। রবি।' মনোজ বউ-এর দিকে তাকাল। হলুদ রঙের নাইটি পরেছে বউ। মনোজের শরীরের ভেতর একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি জেগে উঠল। বউকে জাপ্টে ধরতে ইচ্ছে করল তাঁর।

'রবিকে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'

'দুপুর বেলায় ভ্যান রিক্সা নিয়ে এসেছিল ঘি-এর টিন নিতে। তারপর আর তাঁকে পাওয়া যায় নি।'

'পালিয়েছে তাহলে।'

'ঘি বেচে আর কটা টাকা পাবে যে পালাবে?' রিয়া একটা কটাক্ষ হেনে কথাটা বলল। 'বাবা চিন্তায় পড়েছে। এখনও ঘুমোন নি।'

'মা?'

'জেগে আছে।'

মনোজ ভেতরে ঢুকল। সারা দিন খুব বাজে গরম গেছে। স্নান না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। আগে কুয়োর পাড়ে স্নান করতে হত। রিয়া আসার পর বাড়িতে কল বসান হয়েছে। বাথরুম বানান হয়েছে। কুয়োর জল পাম্প করে ট্যাঙ্কে তোলা হয়। শাওয়ারের জলে স্নান করতে বেশ লাগে মনোজের।

'তোমার গরম লাগছে না?' জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল মনোজ। 'আমার সঙ্গে স্নান করবে নাকি?'

কথাটা বলে মনোজ ভেবেছিল রিয়া জবাবে মুখ বেঁকিয়ে চলে যাবে। কিন্তু সে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'মা-বাবা জেগে আছে। ঘুমিয়ে পড়ুক।'

হুইস্কির আমেজটা টুক করে ফিরে এল রিয়ার কথায়। মনোজ কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে গদ গদ স্বরে বলল, 'আজ খুব গরম। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করব বুঝলে?'

'ভৃগু জ্যোতিষের কথা মনে আছে তো? পাঁচ বছর।'

বিয়ের তিন বছর পরও রিয়া-মনোজের বাচ্চাকাচ্চা না হওয়ার কারণ ফালাকাটার ভৃগু জ্যোতিষি। সে মনোজের কুষ্ঠি বিচার করে সাফ বলে দিয়েছিলেন যে বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে বাচ্চা নিলে ফল ভাল হবে না।

'স্টকে কন্ডোম নেই বুঝেছ?' মনোজের গালে একটা আদরের চাঁটি মেরে রিয়া ঘরে ঢুকে গেল। মনোজ কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর ঝড়ের বেগে জামাপ্যান্ট পরে বাইকে চাপতে চাপতে বলল, 'দোকানের চাবিটা দাও তো!'

রিয়া যেন জানত মনোজ বাজারে গিয়ে দোকান খুলে কন্ডোমের প্যাকেট নিয়ে আসবে। সে নিঃশব্দে চাবির গোছাটা নিয়ে মনোজের হাতে তুলে দিল।

'কোন ব্রান্ডটা আনব বলো তো? ভ্যানিলা না স্ট্রবেরি?'

'যেটা খুঁজে পাও। দোকান আজ ফাঁকা। অন্যদিন রবি সেখানে ঘুমোয়।'

'মালটা কি সত্যিই বেপাত্তা?'

'তাই তো শুনছি। কাল থানায় যেতে হবে।'

'সে আমি বুঝে নেব।'

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে মোটর বাইক নিয়ে ছুটল মনোজ। বাজারে যাওয়ার আগে একবার হাইওয়েতে উঠতে হবে। সেখানে জয়কৃষ্ণ ধাবায় হুইস্কি পাওয়া যায়। স্নান করার আগে দু-পাত্র না খেলে জমবে?

৩

খুব ভোরে উঠে পড়েন রাধু বর্মন। স্কুলের পড়াশুনোয় মন না থাকলেও তাঁর দেখার চোখ আর ভাবার মন ছিল। নিজের ভাগের কৃষিজমির বেশির ভাগটাই তিনি বেচে দিয়েছেন। বাড়ির পেছনের ঢালু জমিটা কিনেছিলেন আজিজুল মিঞার কাছ থেকে। কেরলের এক চা বাগানে অনেক দিন কাজ করে দেশে ফেরার পর আজিজুল প্রায়ই বলত তাঁর নদীর পাড়ের জমিটা চায়ের পক্ষে দারুণ হবে। কিন্তু বাগান তৈরির করার মত টাকা তাঁর নেই। একদিন ভোরবেলা রাধু বর্মন আজিজুলের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলেছিলেন, 'তোর জমিটা বেচবি। আমি চা-বাগান করব। চাষের দায়িত্ব তোর। আধাআধি বখরা।'

এটা ছোট ছেলের বিয়ের ঠিক আগে আগে। বাগান বানাতে গিয়ে ভালো টাকাই লাগাতে হয়েছে রাধু বর্মনকে। কিন্তু তিনি জানেন টাকা উঠে যাবে। কৃষিজমি বেচতে হয়েছে বাগান বানাতে। কিন্তু সে জমিতে ব্যবসা সামলে চাষবাস করা আর সম্ভব হচ্ছিল না। ছেলেরা কেউ চাষবাসের দিকে যায় নি। কাকাদের বাড়িটা ঠিক পাশেই। দুই কাকা আর তাঁদের ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি নিয়ে একসঙ্গেই থাকে। সে বাড়ির সবাই চাষি। বিঘার পর বিঘা জমি তাঁরা সবাই মিলে সামলাতে পারে। ট্রাক্টর আছে। ধান ঝাড়াই-এর মেশিন আছে। দুটো পিক আপ ভ্যান।

দাঁত মাজতে মাজতে চায়ের বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে থাকলেন রাধু বর্মন। বাগান শেষ হলে ঘাস জমি। নদীর পাড় বরাবর উত্তর-দক্ষিণে ছড়িয়ে আছে। তারপর প্রায় কুড়ি ফুট খাড়া নেমে মিশে গেছে নদীতে। হাঁটু জল। তবে পরিষ্কার।

রাতে ঘুম ভালো হয় নি। রবির ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। দুপুরে বাড়িতে ফোন করার আগে রবির মোবাইলে ফোন করেছিল দোকানের এক কর্মচারি। ফোন বন্ধ ছিল। রাধু বর্মন খুব চাপে না পড়লে মোবাইল ব্যবহার করেন না। যন্ত্রটা তাঁর কাছে খুব রহস্যময়। তাঁর এটিএম কার্ড নেই। দরকারে চেক কেটে সই করে প্রাপককে বিস্মিত করে দেন তিনি। রাধু বর্মনের হাতের লেখা বেশ সুন্দর।

হাঁটু জলে স্নান করা শক্ত। তবু তিনি উপুর হয়ে ডুব দিয়ে স্নান করলেন। দিনটা আজও গরম যাবে। ভোরবেলাতেও বিশেষ আরাম লাগছিল না রাধু বর্মনের। স্নান সেরে গা মুছতে মুছতে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কৈলাস মন্ডল লুঙ্গি ছেড়ে গামছা পরছে।

'আপনের একটা কর্মচারি ভাগসে শুনলাম। ঘি লয়্যা ভাগসে। কয় টিন?'

'তিনটে। তুই জানলি কী করে?'

'আরে রবি ঘি লয়্যা ভাগসে— হেই খবরটা এখন হিট!' কৈলাস মন্ডল দাঁত বের করে হাসল। 'সাথে ভ্যান রিক্সাও ছিল। রিক্সা চালাবে আর ঘি দিয়া ভাত খাইবে হেঃ হেঃ হেঃ!'

রাধু কর্মকার গা মুছে পাড় বেয়ে ওপরে উঠে এসে কৈলাসের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেসটা অত সোজা না। ভ্যান রিক্সা চালিয়ে যাবে কোথায়? আমার দোকানের কর্মচারিদের এলাকার সবাই চেনে। কেউ ওকে কোথাও যেতে দেখেনি।'

'বলেন কী?' কৈলাস মন্ডল চমকে যান। 'আমিও কিন্তু ভাবসিলাম ঘি আর ভ্যান লয়্যা শালা কী আর মারাবে! নেশা ভাঙ করত নাকি?'

'নেশা করলে কি মানুষ হাওয়ায় উবে যায়?'

'আমিও তাই ভাবসিলাম! কেস তবে সিম্পিল না। রবির বাড়িতে খবর নিসেন?'

রাধু বর্মন এবার একটু দমে গিয়ে বললেন, 'রবির বাড়িটা ঠিক কোথায় সেটা জানি না। মাথাভাঙ্গাতে বাড়ি বলেছিল।'

'ও আপনের দোকানেই তো থাকত?'

'দোকান লাগোয়া ছোট ঘরটায় রাতে ঘুমোত। সেখানে ওর একটা বড় ব্যাগ আছে।'

'ওই ব্যাগ খুইলা ফ্যালেন। দেখবেন ভোটের কার্ড-ফার্ড পায়া যাবেন। ঠিকানাও পাবেন।'

'দেখি।'

রাধু বর্মন এগিয়ে গেলেন। রবি তাঁর দোকানে কাজের খোঁজে এসেছিল একদিন দুপুর বেলা। সেদিন হাটবার ছিল না। মেঘলা আকাশ আর অল্প অল্প বৃষ্টি। ফাঁকা দোকানে রাধু বর্মন জমিয়ে গল্প করছিলেন মর্ডান ডিজিটাল সেলুনের মালিক গোকুল দাসের সঙ্গে। রবি সে সময়টায় এসেছিল। দোকান সামলাবার মত কর্মচারির অভাব না হলেও ফাইফরমাস খাটা আর বাড়ির গোডাউন থেকে মালপত্র আদানপ্রদানের জন্য একটা ছেলে খুঁজছিলেন তিনি। রবি সে কাজ করতে রাজি হওয়ায় একটু অবাক হয়েছিলেন। ছেলেটির বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। কথাবার্তায় বেশ বুদ্ধিমান মনে হচ্ছিল। স্বাস্থ্যবান। কথায় কথায় জানা গেল তাঁর তিনকূলে কেউ নেই। ভাঙা একটা বাড়ি আছে। সেখানেই থাকে। টুকটাক কাজ করে। বাইরে কোথাও চলে আসতে চায়। কোনও কাজেই তাঁর আপত্তি নেই।

'উনি যে কাজের লোক খুঁজছেন সেটা তুই জানলি কী করে?'

প্রশ্নটা করেছিল গোকুল দাস। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'মাথাভাঙ্গার পিসি ডিস্ট্রিবিউটারের পরান চন্দকে চেনেন? মালিক? তিনিই বলেছেন।'

'তাঁকে তুই চিনলি কী করে?'

'লোকাল লোক। চিনব না? ফোন করে দেখতে পারেন।'

'কিন্তু চন্দবাবু জানলেন কী করে?'

'তাঁকে আমিই বলেছিলাম।' রাধুবাবু বলেছিলেন। 'আসলে লোকালে তো কাউকে পাচ্ছিলাম না। পরানবাবুর লোক গেল সপ্তাহে পাট কিনতে এসেছিল।

তাঁকেই বলেছিলাম মালিককে বলতে খোঁজে ছেলের থাকলে যেন পাঠিয়ে দেয়।'

পরদিন থেকেই কাজে বহাল হয়ে গিয়েছিল রবি। মাথাভাঙ্গা থেকে একটা বড় ব্যাগ নিয়ে চলে এসেছিল। সেই থেকে আছে। বেশ মিশুকে স্বভাবের বলে শালগুড়ির অনেকেই তাঁকে চিনে গেছে। বিশেষ করে কম বয়সী মেয়ে কাস্টমার সামলানর ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা রাধু বর্মনকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল।

'পরান চন্দ!' বিড়বিড় করে বললেন রাধু বর্মন। 'পরানবাবুকে ফোন করলে ঠিকানাটা পাওয়া যাবে ছেলেটার।'

ভোর গড়িয়ে সকাল হচ্ছে। এই সাত সকালেই সূর্যকে খুব তেজি মনে হচ্ছিল রাধু বর্মনের। মনে হচ্ছে আজও জ্বালাবে। রাধু বর্মন চিন্তিত মনে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরলেন। বউ সুবালা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। বরকে দেখে বললেন, 'সাত সকালে স্নান করলা নাকি? কাল তো সারা রাত ভালো করে ঘুমাও নাই!'

'আসলে রবির ব্যাপারটা—'

'ভ্যান আর ঘি নিয়া ভাগছে ছোকরা! আরও বিশ্বাস কর!'

'গত তিন মাস মাইনে তোলে নাই। আমার কাছে জমা আছে। ভাগলে সেটা নিয়ে ভাগত।'

'সেটা তো আমাকে বল নাই!'

'দরকার হয় নাই তাই বলি নাই।'

'তা দরকার হবে কেন? তিন মাস মাইনে নিচ্ছে না তো চলতেছে কী করে সেটা ভাবছ?'

'ওর আর খরচা কী? দু-বেলার খাওয়ার খরচা তো দোকান থেকে দেওয়া হয়।'

'তা বলে কি পয়সা লাগে না? মোবাইলের খরচা?'

রাধু বর্মন চুপ করে গেলেন। বউ রেগে যাচ্ছে। তর্কে হেরে গেলেই সে রেগে যায়। তিনি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পড়লেন। রিয়া এসে চা দিয়ে গেল। শ্বাশুড়ি যখন শ্বশুরের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে তখন রিয়া চুপ করে থাকে। রাধু বর্মন আজ দেখলেন বউমার মুখে হাসি।

'হাসছে কেন?'

'রবি নিয়ে অত ভাবছেন কেন? সে পালিয়ে গেলে যাবে!'

'পালায় নাই।'

রিয়া দু-সেকেন্ড শ্বশুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এত সিওর হচ্ছেন কেন?'

রাধু বর্মন তক্ষুনি কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

৪

বছর চারেক হল স্কুলে চাকরির সূত্রে কাঁথি থেকে সন্দীপ জানা শালগুড়িতে বসবাস করছেন। বেশ কিছুদিন হল তাঁর জন্য বাবা-মা হন্যে হয়ে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সন্দীপ জানার বিয়েতে মন নেই। এর প্রথম কারণ এই যে তিনি ডুয়ার্সের জঙ্গলের মোহে পড়েছেন এবং লম্বা লেন্সওয়ালা ক্যামেরা কিনে পাখির ছবি তুলে বেড়াচ্ছেন। জঙ্গল তাঁর মনের সিংহভাগ অধিকার করে যতটুকু জায়গা রেখে দিয়েছে সেখানে বসে পড়েছে মনোজ বর্মনের বউ। এখানে চাকরিতে জয়েন করার কয়েক মাস পর তাঁর স্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্য মনোজবাবুর বিয়ে হয়। সন্দীপ সে বিয়েতে গিয়েছিল, কিন্তু বউকে সেভাবে দেখে নি। সেটা দেখল কিছুদিন পর যেদিন মনোজ বর্মন রিয়াকে নিয়ে স্কুলে এলো। বউ দেখে স্কুলের ছোকরা টিচাররা সকলেই দীর্ঘশ্বাস গোপন করেছিল ঠিকই কিন্তু সন্দীপ একেবারে বোল্ড আউট হয়ে যায়। এরপর থেকে নানা অছিলায় সে গেছে মনোজের বাড়ি। রিয়ার সঙ্গে আলাপও জমেছে কিছুটা। কিন্তু মেয়েটা একটা পর্যায়ের পর আর ভাঙে না। সন্দীপ জানা অবশ্য গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে মনোজবাবুর সঙ্গে রিয়া বেশিদিন ঘর করতে পারবে না। ডিভোর্স হবেই।

এ বার খুবই গরম যাচ্ছে। স্কুল ছুটির পর সন্দীপ জানা মাগুরমারি দীঘির পাড়ে ছবি তুলতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে বাজারে একটা চায়ের দোকানে বসে ভাবছিলেন কী করা যায়। তাঁর ভাড়াবাড়ি হাটের কাছেই। দু-তিন মিনিটের হাঁটাপথ। সন্দীপ জানা সিগারেট ধরিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে লোকজনের যাওয়া আসা দেখছিলেন। চায়ের দোকানের ছোকরা মালিক দেয়ালে একটা নায়িকার ছবি লাগিয়েছে। হেবি সেক্সি। দেখলেই রিয়ার চেহারাটা ভেসে উঠছিল সন্দীপ জানার মনে। রিয়াকে সাজিয়ে ফোটো তোলার সুপ্ত বাসনাটা সন্দীপের মনে জেগে উঠে খোঁচা মারতে শুরু করল। নায়িকার ড্রেসে সাজাতে পারলে কোনও কথা হত না।

তখনই রিয়ার শ্বশুরকে দেখা গেল দোকানে ঢুকতে। ছোকরা দোকানদারটি তাঁকে দেখে বলল, 'আসেন রাধুকাকা! চা খাবেন নাকি?'

'তোমরা কোনও খবর টবর পাইলা?'

'কোথায় খবর! রবি মনে হয় ভ্যানিশ হয়া গ্যাসে। ও পালাইসে।'

'রবি মানে আপনার দোকানের কর্মচারি?' সন্দীপ জানা উজ্জীবিত হলেন। 'কী হয়েছে তাঁর?'

'জানেন না?' চায়ের দোকানি মুখ ঘুরিয়ে বলল। 'রবিকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না!'

'সে কী!' সন্দীপ জানা উঠে দাঁড়ালেন। মনে হল যেন রবি তাঁর ভাই। 'একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না?'

'না মাস্টার মশাই।' রাধু বর্মন মাথা দুলিয়ে জানালেন। 'রবিকে চিনতেন তো আপনি?'

'হ্যাঁ। আপনার দোকান থেকেই তো মাসের খরচা নিই।'

'কাল ভ্যান রিক্সা নিয়ে গেছিল আমার বাড়ির গোডাউন থেকে ঘি আনতে। ঘি নিয়েছিল। তারপর কোথায় গেছে কেউ জানে না। ফোন বন্ধ।'

'ছেলেটা তো মনে হয় না ঘি নিয়ে পালিয়ে যাবে।'

'সেটা তো আমিও বিশ্বাস করি। রবি তেমন ছেলে নয়। কিন্তু লোকে মানছে না। মনে হচ্ছে থানায় খবর দিতে হবে।'

'থানায় আমার চেনা আছে। আমাদের কন্টাই-এর একটা ছেলে আছে ময়নাগুড়ি থানায়। গেলে বলবেন।'

'দেখি।'

রাধু বর্মন অন্যমনস্কের মত দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। আসলে তিনি বাজারে ঘুরে ঘুরে রবির খবর পাওয়ার চেষ্টা করছেন। অবশ্য এটা করার কোনও দরকার ছিল না। ঘটনাটা সবাই জানে। খবর থাকলে তিনি পেয়ে যেতেন।

রাধু বর্মন চলে যাওয়া মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তাঁর বাড়ির দিকে সন্দীপ জানা বাইক নিয়ে ছুটলেন। এই অছিলায় রাধুবাবুর বাড়িতে গিয়ে একবার রিয়াকে দেখে আসা যায়। যদি মনোজবাবু থাকেন তবে স্কুলের একটা ব্যাপার নিয়ে কথা তোলা যাবে। সঙ্গে আজ ক্যামেরাটাও আছে। মনোজবাবু থাকলে আজ সে বলবেই রিয়ার সঙ্গে একটা ছবি তুলতে। মনোজবাবু না থাকলে অবশ্য বলাটা কঠিন হবে।

বাইরের উঠোনে বসে রিয়া একটা ছাগল ছানাকে ফিডিং বোতল থেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। সন্দীপ জানাকে দেখে সে কিশোরীর মত হেসে বলল, 'ক্যামেরা এনেছেন নাকি সঙ্গে?'

সন্দীপ জানা থতমত খেয়ে বললেন, 'এনেছি। কিছু তুলতে হবে?'

'এটা তুলুন। ছাগলকে দুধ খাওয়াচ্ছি।'

সন্দীপ জানা হাতে চাঁদ পেলেন। ঝপাঝপ সাটার টিপতে লাগলেন তিনি। একটা পিঁড়িতে বসে দুধ খাওয়াচ্ছিল রিয়া। ঝুঁকে পড়ার কারণে ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে বুকের খাঁজ দেখতে পারছিলেন সন্দীপ জানা ক্যামেরার ডিসপ্লেতে। তিনি অনেকটা জুম করলেন। এ ছবি রিয়াকে দেখান যাবে না।

'কী তুললেন দেখান এবার!'

আঁচল কোমরে পেঁচিয়ে উঠে দাঁড়াল রিয়া। সন্দীপ জানার পুরুষাঙ্গ টন টন করে উঠল।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

স্কেচ স্বরূপ গুহ

গাড়ি আর গাড়োয়ান

স্টিয়ারিং কাটাতে গিয়ে হিসেবের সামান্য একটু ভুলচুক হল।

একে তো সরু গলি, তারপর আবার বাঁক ঘুরতেই সটান সামনে একখানা রোয়াক। প্রাচীনত্বে, যা বোধয়, জোব চার্নকের আমলকার। ফলে, সে রোয়াক ঢুঁসিয়ে একদিকে যেমন গাড়ির ডান চক্ষু কানা হল, অন্যদিকে তেমনি, ঝরঝর করে বেশ অনেকটা ইঁট সিমেন্টের চাঁইও খসে পড়ল রোয়াকের গা থেকে।

—মাই গুডনেস! এ আপনি কী করলেন!

ফ্রন্ট সীটে, ড্রাইভারের পাশে বসা স্যুট টাই পড়া সেলস একজিকিউটিভ লোকটি, মৃগী রোগীর মত হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল। যার দমকে এমন চমকে গেল চম্পক, যে স্টিয়ারিং থেকে পিছলে পড়ে গেল হাত। এখন মুখ বুঁজে নির্বাক থাকাই শ্রেয় বুঝতে পারছিল সে। কিন্তু মুখ যে বড়ই মূর্খ। তাই ফস করে কথা বেরিয়ে পড়ল, এয়ার ব্যাগ ফুলল না তো! এয়ার ব্যাগ নেই গাড়িতে?

—বজ্জাতি হচ্ছে? নতুন গাড়ি চটকে দিলেন... আবার এয়ার ব্যাগ?

রক্ত চক্ষু সেলস একজিকিউটিভের সে কি হুঙ্কার! কে বলবে একটু আগে অবধি এই লোকটাই সহাস্যে অতি বিনয়ী ভঙ্গীতে গাড়ির গুণপনা বর্ণনা করছিল! এই যে একটা অতি জরুরি ফিচারের অনুপস্থিতি নিয়ে চম্পক সময়োচিত সিরিয়াস প্রশ্ন করল, তার কোনও জবাব দেওয়ারই দরকার বোধ করল না লোকটা। বরং গাড়ির দরজা খুলে তড়বড় করে বাইরে বেরিয়ে গেল, ক্ষতির খতিয়ান নিতে।

ঝাঁ চকচকে শো রুমে, মদিরতা মাখা উজ্জ্বল রূপ ধারণ পূর্বক, শুধু পোজ দিয়ে দিয়েই এতকাল নিষ্কর্মা কাল কাটাচ্ছিল ব্র্যান্ড নিউ গাড়িটি। আজ টেস্ট ড্রাইভে তার চাকা রাজপথ স্পর্শ করায় নিশ্চয় আলাদা একটা আনন্দে বিভোর ছিল সে এতক্ষণ। কিন্তু আচম্বিত অঙ্গহানি সেই উল্লাসে জল ঢেলে দিয়েছে। ধাক্কার পর থেকে একটানা ট্যাঁ ট্যাঁ করে যে অ্যালার্মের মত একটা শব্দ হয়ে চলেছে, সেটা যেন ওই প্রতিক্রিয়ারই প্রতিধ্বনি!

—আপনি... আপনি... আপনি... স্যার কত বড় যে ননসেন্স...

বাইরে এসে, সেলস একজিকিউটিভ তোতলাতে লাগল। অতঃপর, যেই না সে ভাঙ্গা হেডলাইট-টায় হাত ছুঁইয়েছে, অমনি সেখান থেকে আরও এক টুকরো লুজ কাঁচ মাটিতে খসে পড়ল ঝনঝন করে।

চক্ষুলজ্জার খাতিরে চম্পককেও বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। সে দেখল কোথাও কোনও টোল খায়নি গাড়ির সম্মুখভাগ। হয়েছে শুধুমাত্র হেডলাইট ভঙ্গ। মনে মনে খানিক নিশ্চিন্ত বোধ করল। একখানা হেডলাইট বাবদ কত আর গচ্চা যাবে?

কিন্তু, তখুনি রোয়াকের পার্শ্ববর্তী জানালাতে একটি টাক মাথা উঁকি দিল। প্রথমটায়, অলস কৌতূহলে বাইরের পরিস্থিতি উপভোগ করার মুড প্রদর্শিত হচ্ছিল তার চোখে মুখে। কিন্তু রোয়াকের হাল যেই চোখে পড়েছে, অমনি ইলেকট্রিক শক লাগা প্রাণীর মত গা ঝাড়া দিয়ে এক বিরাট হুঙ্কার ছাড়লো সে, অ্যাই হতভাগারা! বাড়ি ড্যামেজ করার সাহস হয় কোত্থেকে? প্রসূন... পল্লব... কোথায় গেলি সব? ওরে, তাড়াতাড়ি আয়, গাড়িটা আটকা! শিগগিরি নম্বর টুকে নে!

সেই চ্যাঁচানির ঠেলায় পলকের মধ্যে নরক গুলজার হয়ে উঠল ভবানীপুরের ওই সরু গলিতে। দুপুরের এই সময় অঞ্চলটি একদম ফাঁকা থাকে বলেই এখানটাতে টেস্ট ড্রাইভে আসা। কিন্তু গোলযোগের গন্ধ পেয়ে প্রায় যেন মাটি ফুঁড়ে লোকজন আবির্ভূত হতে লাগলো চারপাশে।

অ্যালার্ম বেল হয়ে চ্যাঁচাচ্ছিল যে টেকো লোকটা, সে ততক্ষণে একটা টিনের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে রোয়াকের সামনে। উপস্থিত জনতার মধ্যে একজন তার উদ্দেশে হাঁক পেড়ে বলল, মাকুদা... তোমায় ধাক্কা মেরেছে বুঝি?

দেখে তাই মনে হচ্ছে? মাকুদার স্বরে বিরক্তি। এদিকে এসে দেখ, রোয়াকটা কতখানি ধ্বসিয়ে দিল! মাইরি, গাড়ির বনেটে চেপে ধাঁই ধাঁই করে দাপাতে ইচ্ছে করছে!

—প্লীজ... কী বলছেন দাদা!

সেলস একজিকিউটিভ কঁকিয়ে উঠে ছুটে গেল মাকুদার সামনে, এভাবে পাবলিককে উস্কাবেন না!

—চোপ মশাই! র‍্যাশ ড্রাইভিং-এর সময় মনে ছিল না?

—আমি না, আমি না... ইনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন...

ইংরেজিতে যাকে বলে 'আকিউজিং ফিঙ্গার', আপন তর্জনিকে একদম তার আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ বানিয়ে চম্পকের দিকে তাক করল সেলস একজিকিউটিভ। সমবেত জনতার চক্ষু একযোগে সেই আঙ্গুল অনুসরণ করে চম্পকের দিকে তাকাল। আর চম্পকের তখনকার

অনুভূতি হল... সে যেন কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক জমায়েতে প্রধান বক্তার ভূমিকায়। এতগুলো জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে চুপচাপ থাকা খুব কঠিন কাজ! ফলে কথার খই ফুটল তার মুখে, দেখুন... কী অন্যায় দোষ দিচ্ছে আমায়! উনি জোর না করলে আমি এত সরু গলিতে কেন গাড়ি ঢোকাব? ওনার গাড়ি... উনি বললেন... আর আমি তাই বাধ্য হয়ে...

—অ্যাই তো! পেয়ে গেছি!

মাকুদার চোখ এমন জ্বলজ্বল করে উঠল, যেন আর্কিমিডিস তার জগৎ বিখ্যাত সূত্রটির আবিষ্কার সম্পন্ন করেছে! গুটি গুটি পায়ে চম্পকের সামনে এসে ভুরু নাচাল সে, তুমি ড্রাইভার? তাই না? মানে, তুমিই হলে যত নষ্টের গোঁড়া।

—না না, ও দাদা, আপনি ভুল বুঝছেন...

সেলস একজিকিউটিভ এগিয়ে এল তড়বড় করে। বলল, ড্রাইভার নন। উনি কাস্টমার। গাড়ি কিনবেন বলে আমাদের শো রুমে...

...টেস্ট ড্রাইভ করতে এসেছিলাম... চম্পক বাকিটা পাদপূরণ করে দিল। মাকুদার চোখ তখন চর্কির মত পাক খেয়ে একবার চম্পক আর একবার সেলস একজিকিউটিভ... এই দুটি বিষয়বস্তুকে বুড়ি ছোঁয়া করল কয়েকবার। লক্ষণ দেখে বোঝাই যাচ্ছে... নিঃসন্দেহে মনঃস্থির করতে পারছে না। শেষে বিরক্ত সিংহের মত গর্জন করে সে বলল,

—ওহহ! পুরো গুলিয়ে দিচ্ছে তো এই দুটোতে মিলে! আমার বাপু অত জেনে কাজ নেই। সাফ বলো, রোয়াকটা মেরামত কে করবে?

—মিস্তিরি!

আবার সেই মূর্খ মুখের কারসাজি! নিজের অজান্তেই দুম করে জবাব দিয়ে ফেলে, ফাঁদে পড়ে গেল চম্পক। ঈশ! এরকম গরম সিচুয়েশনে কেউ বলে এমন কথা?

—দেখেছেন? দেখেছেন তো কেমন ননসেন্স লোক?

সেলস একজিকিউটিভ নালিশের সুরে বলল জমায়েতের সমস্ত মানুষের উদ্দেশে। এদিকে মাকুদার মুখটা তখন একদম নিমপাতা চিবোনো গোরিলার মতো ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,

—ননসেন্স তো আপনিও। এই তার কাটা মালটাকে স্টিয়ারিং-এ বসাবার আগে, পকেটে লাইসেন্স আছে কিনা, একবারও দেখেছিলেন?

সেলস একজিকিউটিভের টনক নড়ল। এমন নড়ল, একেবারে যেন লন্ডনের বিগ বেন ঘড়ির ভারি পেন্ডুলাম। তড়িৎ গতিতে এগিয়ে এসে চম্পকের নাকে নাক ঠেকিয়ে সে বলল,

—কোথায় লাইসেন্স? দেখান?

চম্পক মাথা চুলকোতে লাগল। তার মূর্খ মুখে এবার কঠোর তালা চাবি। অধৈর্য সেলস একজিকিউটিভ সালিশ মানতে অগত্যা মাকুদার দিকে ফিরে তাকাল,

—দেখেছেন? এখন কথা বন্ধ। দেখেছেন তো, কী ধড়িবাজ?

—আমি দেখে কি করব? আপনি দেখুন!

মাকুদার স্বর ধারালো চাকুর মতো ঝলসে উঠল।

—শো রুমে একটু ঝাঁ চকচকে জামা কাপড় পড়ে যে কেউ হাজির হলেই আপনারা উইদাউট ভেরিফিকেশন গাড়ির স্টিয়ারিং তুলে দেন হাতে। এটা তো আপনাদেরও দোষ!

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন তখন টিপ্পনি কেটে বলল, এরা যে স্রেফ বেচুবাবু! গাড়ি বেচতে হবে না? ঘাড়ে সবার মাস্থলি টার্গেট আছে!

—আছে না নেই?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে চম্পক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কানের কাছে বোমা ফাটার মত স্বর শুনে চমকে তাকালো সেলস একজিকিউটিভের দিকে। যে কিনা, কথাটা আবার রিপিট করল,

—কি হল? আছে না নেই?

মাথা চুলকে অদ্ভুত আরাম হয় চম্পকের। এতই আরাম, যে খানিকক্ষণের জন্য পারিপার্শ্বিককে সে ভুলে মেরে দেয়। এখানেও কিছুটা সেরকমই হয়েছে। তাই বিভ্রান্ত স্বরে সে শুধোলো,

—কী বলুন তো?

—আরে ননসেন্স... লাইসেন্স! লাইসেন্স!

—ওওও... লাইসেন্স? তাই বলুন! হ্যাঁ, আছে তো।

—কোথায় সেটা? দেখান সবাইকে!

—দেখাতে হবে?

—অসহ্য ন্যাকামো করছেন কিন্তু! আমরা কি মস্করা করছি আপনার সাথে?

সেলস একজিকিউটিভের সূক্ষ্ম দলবদলটা ধরতে পেরে মনে মনে তারিফ করতে বাধ্য হল চম্পক। 'আমরা' শব্দটা ও এমন ভাব এবং ভঙ্গীতে বলল, যেন ইতিমধ্যে এই জনতার অংশ হয়ে পড়েছে। বলতে গেলে, ওদের প্রতিনিধি! আর চম্পক এখন তার বিরুদ্ধ পক্ষ!

—আরে! অনেক হয়েছে, আর টাইম ওয়েস্ট করবেন না! আপনি তাড়াতাড়ি দেখান দেখি...

চিয়ার লিডারের মতো সর্বাঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে, কড়া কণ্ঠে আবার তাড়া দিলো সেলস একজিকিউটিভ। আর চম্পক, ধীরে ধীরে ব্যাক পকেট থেকে তার মানি ব্যাগখানা বের করে আনলো। এখন নাটকের মুখ্য চরিত্র তারা দুজন মাত্র। উপস্থিত বাকি সবাই দর্শক হয়ে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায়!

এবারে চম্পক মানি ব্যাগ খুলে, ল্যামিনেশন করা একটি কার্ড বার করতেই দর্শকদের রুদ্ধশ্বাস এক যোগে মুক্তি পেল। আর হাওয়া বেরোনোর সেই শব্দের তালে ঠিক ঠিক তাল মিলিয়ে চুপসে গেল সেলস একজিকিউটিভের মুখ। তবে, চম্পকের মুখেও যে ঠিক বিজয়ীর হাসি, তেমনটা বলা যায় না। বরঞ্চ বেশ শুকনো মুখেই কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে সে বলল, এই যে... নিন।

হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিল সেলস একজিকিউটিভ। এবং তাতে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে তার চক্ষু চড়কগাছ। একটা বিষম খেয়ে সে কাটা রেকর্ড হয়ে গেল পুরো!

—এটা তো... এটা তো... এটা তো...

—আরে কী? সেটা তো বলবেন?

মাকুদার গলা গমগম করে উঠল। সেলস একজিকিউটিভ হাল ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে। কার্ডটা মাকুদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে দু' হাতে নিজের মাথা চেপে ধরল সে। বিড়বিড় করে বলল, জাস্ট আনবিলিভেবল!

এদিকে, মাকুদার মুখ তখন থমথমের ওপর আরেক পোঁচ থমথমে। চোখে জল্লাদের দৃষ্টি।

কার্ডটা দু' আঙ্গুলে ধরে উঁচু করে তুলে দেখালো সে সবার উদ্দেশ্যে। এবং চেঁচিয়ে বলল,

—লাইসেন্সের ছিরি দেখো! চালাচ্ছে চার চাকা! এদিকে পকেটে দু চাকা গাড়ির লাইসেন্স নিয়ে ঘুরছে!

চারদিকে পিন ড্রপ সাইলেন্স। একমাত্র চম্পক বাদে, উপস্থিত প্রতিটি লোক একদম হাঁ। চম্পক গলা খাঁকারি দিল। এবং মিনমিন করে বলল,

—ফোর হুইলারের জন্য আমার অ্যাপ্লাই করা আছে কিন্তু...

এতে যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ হলো। জাস্ট বোমার মতো ফেটে উঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো মাকুদা,

—মাথা কিনে নিয়েছ! এরপর তো গরুর গাড়ির গাড়োয়ানও বলবে আমি গাড়ি ড্রাইভ করার যোগ্য!

এর পরবর্তী ঘোরালো ঘটনাটা, সেদিন কোনওরকমে একটা জোড়াতালি দিয়ে ম্যানেজ করেছিল চম্পক। যদিও, এখানে আমি তার আসল নামটি ব্যবহার করলাম না।

পেশাতে চম্পক সে একজন সুপরিচিত চিত্র সম্পাদক বা এডিটার। দূরদর্শন পরবর্তী যুগে যখন প্রাইভেট চ্যানেল সবে আসতে আরম্ভ করেছে, তখন সে চ্যানেল এইট-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটার হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছিল। সেখানেই আলাপ ওর বর্তমান জীবন সঙ্গিনীর সঙ্গে। যে কি না ছিল একজন একজিকিউটিভ প্রোডিউসার। টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি যত বড় হয়েছে ওরা দুজনেও ধাপে ধাপে সামনে এগিয়েছে। এখন চম্পক এক সাথে আট দশটা মেগা সিরিয়ালের এডিট সামলায়। ওর আন্ডারে কাজ করে প্রায় সমান সংখ্যক অ্যাসিস্টেন্ট এডিটার। আর চম্পকের স্ত্রী এখন নামী এক চ্যানেলের প্রোগ্রামিং হেড।

অনেক রাতে এডিট সেরে বেরোনোর সময় সেদিন আমাকে চম্পক নিজের গাড়িতে লিফট অফার করেছিল। আনোয়ার শাহ রোডের মুখে পেট্রল ভরতে দাঁড়িয়ে, এই গাড়ি কেনার গল্প শুরু হল। যাদবপুর থানা থেকে বাইপাস কানেক্টার ধরে যতো এগোচ্ছি, গল্পও ততো এগোচ্ছে।

—তাহলে, এটাই বুঝি সেই রোয়াক ধ্বসানো গাড়ি?

গল্পের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে আমি জানতে চাইলাম। চম্পক স্টিয়ারিং থাবড়ে হাসতে হাসতে বলল,

—তাছাড়া, আর কি? রোয়াক সারাতে গ্যাঁট গচ্চাটা সেদিন আমিই দিয়েছিলাম। আর বউ-এর তরফ থেকে বার্থ ডে প্রেজেন্টটা অনেকদিন ডিউ পড়েছিল। সেটাকে ভাঙ্গিয়ে গাড়ি করলাম! তবে মিথ্যে বলবো না, হেড লাইট কিন্তু শো রুম থেকে ফ্রি-তেই রিপ্লেস করে দিয়েছিল!

রাস্তায় সামনে এসে পড়েছে একখানা সাদা কালো ডোরাকাটা বাম্পার। চম্পক গাড়ির গতি কমিয়ে দক্ষ হাতে গিয়ার চেঞ্জ করল। তারপর বাম্পার পেরোতেই আবার গতিবৃদ্ধি। বোঝাই যাচ্ছে, চার চাকার লাইসেন্স পাওয়ার পর চম্পক আর সেই গাড়োয়ানটি নেই। আমি হেসে বললাম, —তবে যাই বলো, লাইসেন্স-এর ধাক্কাটা কিন্তু জব্বর দিয়েছিলে সেদিন।

চম্পক স্বভাবসিদ্ধ মিচকে ভঙ্গিতে জবাবি হাসি হাসতে, এবার একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম আমি,

—টু হুইলারের লাইসেন্স কি তুমি শখ করে করিয়েছিলে? তোমাকে তো ভাই বাইক বা স্কুটার চালাতে দেখিনি কখনো?

—আরে না। আমার জন্য নয়। ওটা আমার বাবার স্কুটারের জন্য করা।

—বাবার স্কুটার?

—আরে হ্যাঁ! বেকার জীবনে আমার প্রথম ইনকাম সেই লাইসেন্স-এর জন্য...জানো তো!

—সে আবার কী রকম?

—পাক্কা এক বছরের জন্য... বাবা যে আমাকে স্কুটারের ড্রাইভার রেখেছিল! যেখানে যেখানে কাজ থাকত, বাবাকে পেছনে বসিয়ে পৌঁছে দেয়া আর নিয়ে আসা... এই কাজ করতাম একদম মাস্থলি স্যালারিতে!

অভিজিৎ সরকার

সুরজিৎ বসু'র 'অবতামসী'

বইপত্র সাহিত্য

সুরজিৎ বসুর 'অবতামসী' দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে বছর দুয়েক হল, প্রায় পাঁচ দশক পরে। বইটি দীর্ঘদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না। কলকাতার এক প্রকাশক বইটির পুনর্মুদ্রণ করে বাংলা উপন্যাসের পাঠকদের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হলেন। উপন্যাসটি এখনও বহু পাঠকের স্মৃতিতে আছে, আজও বহু উৎসাহী পাঠক উপন্যাসটির সন্ধান করেন।

'অবতামসী' বাংলা কথা সাহিত্যের প্রথম বিপ্রতীপ উপন্যাস বা অ্যান্টি নভেল। ষাটের দশক থেকে উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসের প্রতি বিদ্রুপ ও অবজ্ঞা এবং লেখকের নিজস্ব ভূমিকা এই অদ্ভুত ধরনের অ্যান্টি নভেলের সৃষ্টি করেছে। 'অবতামসী' বাংলা উপন্যাসে এক মাইলস্টোন বিশেষ। পরবর্তীকালে সমরেশ বসু তাঁর 'পাতক', 'বিবর', 'প্রজাপতি'-তে এই অ্যান্টি নভেলের রূপকল্প ব্যবহার করেছিলেন।

'অবতামসী' উত্তম পুরুষে রচিত আলোকের আত্মজীবনীমূলক আখ্যান। এ আখ্যানের আমি 'একা একক। স্বয়ম্ভু। স্বতন্ত্র' একটা বিশেষ যুগের যুগচৈতন্যকে আত্মসাৎ করেই লিখেছিলেন অবতামসী উপন্যাস। 'অবতামসী'-র এই দ্বিতীয় মুদ্রণে, উপন্যাস নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে, যা 'অবতামসী' উপন্যাসটিকে বুঝবার পক্ষে খুব সহায়ক। কথা সাহিত্যিক সুরজিৎ বসু সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান এই দুটি রচনা।

বাংলা উপন্যাসের সীমিত পরিসরে 'অবতামসী' এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টিকর্ম। সুরজিৎ বসুর মত মানুষেরা কখনওই অনস্তিত্বের নৈঃশব্দে মিলিয়ে যেতে পারেন না। রূপকল্প ও প্রযুক্তির দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে 'অবতামসী' প্রথম প্রচেষ্টা। সুরজিৎ বসু প্রচারের আলো তেমন পাননি, এসব তিনি চাননিও। তিনি বলতেন, 'আমি একটু কম ভাল লেখক হয়ে একটু ভাল মানুষ হতে চাই। কোনও অন্যায় বা পাড়ার এক সংকীর্ণ গলিতে, অতি সাধারণ একটি ঘরে থেকে প্রায় সাধকের মত নিয়মিতভাবে লিখে গেছেন। শক্তিশালী কলম নিয়েও কলকাতার সাহিত্য বাজারে হাতজোড় করে দাঁড়ান নি। তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ সুভাষ মুখোপাধ্যায় জোর করে তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতায় প্রকাশের জন্য, তিনি অনুমতি দেননি। 'অবতামসী'র পর 'সপ্তাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল— 'শেষ রাত্রির স্বপ্ন', 'ঘরোয়া' পত্রিকায় 'দক্ষিণ দুয়ার', 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় 'দাঁড়াবার জায়গা'। প্রকাশের অপেক্ষা ছিল দুটি— 'কড়ির পাহাড়' ও 'অন্ধকারের সম্রাট'।

'অবতামসী'র স্রষ্টাকে পাঠক এখনও ভুলে যায়নি। পাঠক সমাজের আগ্রহের কারণেই 'দ্বিতীয় প্রকাশক'। প্রকাশকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম।

অবতামসী। সুরজিৎ বসু।
কলকাতা। সোপান, ২০১৫।

রণজিৎ কুমার মিত্র

প্রবীর রায়ের 'কবিতা জীবন'

প্রবীরদা। এই ডাকটা জলপাইগুড়ির সাহিত্যপ্রেমীদের খুব কাছের। দীর্ঘকায়, সৌম্যদর্শন মানুষটির বাস 'শ্যামলছায়া', তাঁকে ঘিরেই আড্ডা। কবিতার আড্ডা, সাহিত্যের আড্ডা, সংস্কৃতির আড্ডা, 'শ্যামলছায়া'র আড্ডা, রবিবারের আড্ডা, আপনি যেই নামেই ডাকুন এই আড্ডাকে, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে এই আড্ডা সাহিত্য, প্রধানত কবিতার ভাব বিনিময়ের পীঠস্থান হয়ে গেছে। এই আড্ডার প্রাণপুরুষ যিনি, তাঁর পাঁচ দশকের কবিতা জীবন, উত্তাল সত্তর থেকে উত্তরাধুনিক নতুন শতক, সব কিছুই যাঁর লেখায় নিজ ভঙ্গিতে নিজ দর্শনে ফুটে উঠেছে, তিনি প্রবীর রায়।

শুরুর প্রথাগত কবিতাচর্চা কবিকে ভাবায়নি, উত্তাল সত্তরের দশককে তিনি বেছে নিয়েছেন অন্যধারার কবিতা, প্রতিবাদ মিশ্রিত আগুনে নয়, নিবিড় প্রতিবাদ মিশ্রিত কবিতা। কর্মজীবনে নব্বইয়ে তিনি ছিলেন পাহাড়ে, দার্জিলিং-সিকিম সীমান্তের রাম্মামে, যোগাযোগ অপ্রতুল থাকলেও বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুনের শিখা সেই দুর্গম অঞ্চল স্পর্শ করেছিল, আমাদের কবির কবিতায় ছিল ক্ষোভ, ধিক্কার, শান্তি, ভালবাসা।

কলকাতায় বেড়ে ওঠা হলেও কবির জীবন উত্তরবাংলা কেন্দ্রিক, উত্তরবঙ্গ বিশেষত জলপাইগুড়ি কবির বাসস্থান, জলশহরের দীর্ঘকালের কবিতা-সাহিত্য চর্চা তাঁর জীবনের বড় অংশ। কবি অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাগত ব্যতিক্রমী। তার সমকালীন কবিতাচর্চাও নিজস্ব ঘরানার। ক্ষুদ্র পত্রিকা আন্দোলনের সৈনিক, কবির কথাতেই।

প্রবীর রায় অচিরেই সবার সাথে মিশে যেতে পারেন, সবাইকে নিয়ে চলতে পারেন, সেটিই তাঁর সবচেয়ে বড় ইউএসপি। খোলা বাজারের যুগেও যিনি স্বাধীন, নির্ভীক, ব্যতিক্রমী। সবার, সব বয়সের বন্ধু, মনের মানুষ। কারও প্রবীরদা, কারও প্রবীরজেঠু, কারও বা শুধু প্রবীর। সবার হৃদয়েই তার সমানবস্থান।

তরুণ কবিদের প্রিয় প্রবীর রায়, চিরকাল আমাদের মত নতুন লিখতে আসা নতুনদের, বা নিতান্ত সাহিত্যপ্রেমীদের কাছের, তার কারণ বন্ধুর মত মেশা। আড্ডায় কথায় আলোচোনায় কখনও মনে হয়নি যে মানুষটা আমার চেয়ে বহু দশক বয়সে বড়, মনে হয়েছে আমারই সমবয়সী আমারই মত নতুন লিখতে আসা কবিতাপ্রেমী এক বন্ধু, সেই জন্যেই তিনি সবার প্রিয়।

এই কবির বর্ণময় কবিতাজীবন এবার দু-মলাটে। 'কবিতা জীবন'। ৬৫ পর্বের এই গদ্যে কবির জীবন নানা ভাবে ফুটে উঠেছে, পাঠক জানতে পারবেন কবির অনেক জানা অজানা দিক, অনেক অভিজ্ঞতা, মুহূর্ত, সময় বদলানোর কথা। বইটির প্রকাশক 'এখন ডুয়ার্স'। তাঁদেরই আড্ডাঘর-এ রাখি পূর্ণিমার দিন প্রকাশ হল বইটি। কবি যে ব্যতিক্রমী তার আবার আভাস পেলাম আমরা, কোনও রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক 'বড় ব্যক্তি' নন, বইটি প্রকাশ করলেন কবির অকৃত্রিম বন্ধু, জলশহরের জীবনে কবির প্রথম বন্ধু কবি-প্রাবন্ধিক ভাস্কর উদয় ঘোষ।

প্রিয় কবি, প্রিয় মানুষ প্রবীর রায়ের এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের অনেক কবি সাহিত্যবন্ধু তাঁদের কথা বলেন, বলেন কবির সাথে তাঁদের কাটানো সময় তাঁদের ভাবনার কথা। খোলামেলা আড্ডায় অংশ নেন উমেশ শর্মা গোপা ঘোষ পালচৌধুরী অনিন্দিতা গুপ্তরায় শশাঙ্কশেখর পাল পার্থ ব্যানার্জী তপেশ দাশগুপ্ত কমল ভট্টাচার্য সত্যম ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময় বিশ্বাস শুভ্র চট্টোপাধ্যায় দেবাশিস কুন্ডু রঙ্গন রায় তীর্থ অধিকারী অভিশ্রুতি রায় পিয়ালী বর্মন ও প্রতিবেদক। কবির বিভিন্ন কবিতার বই সম্পর্কে আলোচনা করেন রণজিত মিত্র। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন জয়শীলা গুহ বাগচি। এছাড়াও আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সব শেষে বক্তব্য রাখেন প্রবীর রায়।

একাধারে এই অনুষ্ঠান দিলখোলা আড্ডাতেই পরিণত হয়, অনেকটা ভাষাতেই তাঁর সবাইকে নিয়ে চলার কথায়, যেখানে 'আমি মিথ্যে নয়, আমরা একটি সত্যি শব্দ'।

অনুভব দে

হাংরি রিপোর্টার

মাও সে তুং-এর সঙ্গে চিনে গিয়ে মোলাকাত কাহিনী শুনিয়েছিলেন কানু সান্যাল

তুষার প্রধান

আমি বেশ কয়েকটি কাগজে সাংবাদিকতার কাজ করেছি। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে এমন কিছু মানুষ বা ঘটনার সংস্পর্শে এসেছি, সেসব কথাও মাঝে মধ্যে বলা দরকার বলে মনে করছি। সেরকমই একটি অধ্যায় কানু সান্যালের চিন সফর, মাও সে তুঙের সঙ্গে দেখা করে আসার কথা। ভাস্কর নন্দী, সন্তোষ রাণা, খোকন মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, কাকা ওরফে অসীম চ্যাটার্জি এমন অনেক নকশাল নেতার সঙ্গে আমার ওঠাবসা হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। সন্তোষ রাণার সঙ্গে কলকাতার ৮বি পাম প্লেসের কমিউনেও দু'রাত্তির কাটিয়েছিলাম। এসব অনেক পুরনো কথা। সন্তোষ রাণার ওখানে আমি দার্জিলিঙের এক জঙ্গি নেতা ছত্রে সুব্বাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার এক নকশাল নেতা রূপক মুখার্জির সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে ছত্রে সুব্বাকে নিয়ে সন্তোষ রাণার ডেরায় পৌঁছানোর দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। ওই ডেরায় ভাস্কর নন্দীও থাকতেন। ছত্রে সুব্বা তখন ঘিসিং-পন্থী গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকারী।

ছত্রের পরিচিতি ছিল কট্টর জঙ্গি হিসেবে। ঘিসিং যখন পার্বত্য পর্ষদ চুক্তির মাধ্যমে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের এন্তেকাল মেনে নিলেন, এটা তার পর পরের ঘটনা। ছত্রে সুব্বা মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না ঘিসিঙের রাজনৈতিক রফা।

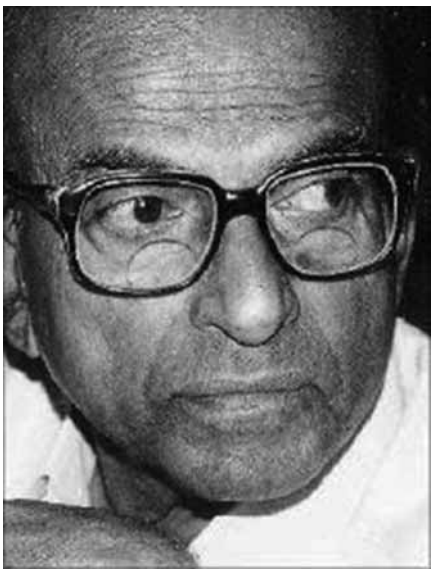

সিকিমের এক উঠতি নেতা কিরণ ছেত্রিকে সঙ্গে করে কলকাতায় গিয়েছিলেন ছত্রে। সেখান থেকে রাঁচি। ঝাড়খণ্ডীদের সমর্থন জোগাড়ের আশায়। ছত্রে সুব্বাকে নিয়ে সে সময় আমি কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং আরও কিছু জায়গা ঘুরেছিলাম। 'আজকাল' কাগজে তার বিশদ রিপোর্ট ছবি সবই বেরিয়েছিল। সন্তোষ রাণার কমিউনে বসে কথা বলছেন ছত্রে, এরকম ছবিও 'আজকাল' কাগজে বেরিয়েছিল। আসলে 'আজকাল' রিপোর্টার হিসেবে যেহেতু ছত্রের সঙ্গে থেকেছিলাম কয়েকদিন, তাই 'আজকাল' কাগজ এইসব এক্সক্লুসিভ নিউজ পেয়ে যাচ্ছিল। অন্য কাগজ তো ছত্রে সুব্বার টিকিরই নাগাল পাচ্ছিল না। ছবি বেরিয়ে যাওয়ার পর সন্তোষ রাণার ডেরায় উঁকি মেরেও ছত্রে সুব্বার নাগাল অন্য রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার কেউ পায়নি। কারণ, ছত্রে সুব্বাকে সযত্নে বগলদাবা করে রাখার দায়িত্ব ছিল আমার ওপরে। আর কলকাতায় ছত্রের যে ক'টি এক্সক্লুসিভ ছবি হয়েছিল, সেগুলি তুলে ছিলেন আজকালের সিনিয়র ফটোগ্রাফার অশোক চন্দ্র।

আজ এই লেখার সঙ্গে ছত্রে সুব্বার নাম জড়িয়ে গেল নকশাল নেতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে। নকশাল নেতাদের মধ্যে খোকন মজুমদার, সুগত সেনগুপ্ত, জঙ্গল সাঁওতাল এঁরা আমায় খুব স্নেহ করতেন। কানু সান্যালও। দৃঢ়চেতা সেই কানু সান্যালের চিন যাত্রার কথা বলব, মাও সে তুঙের সঙেগ কানু সান্যালের দেখা হওয়ার প্রসঙ্গটি বলব। ঠিক আমি বলব না, বলবেন কানু সান্যাল নিজেই। আমি শুধু স্মৃতির সরণি ধরে হাঁটব। সাংবাদিকতা পেশায় এসে এমন বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাঁদের মধ্যে নির্ভীক, সৎ যে ক'জনের কথা মনে গেঁথে আছে, তার মধ্যে কানু সান্যাল অন্যতম।

মাও সে তুঙের সঙ্গে সাক্ষাতের সেই রোমাঞ্চকর বাইশ মিনিট। অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় এমন অনেক কথাই বলেছিলেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ কানু সান্যাল।

সেদিন টেপ রেকর্ডার চালানো মাত্রই কানু সান্যাল শুরু করেছিলেন এইভাবে।

"১৯৬৭ সালে সেপ্টেম্বরের একদম শুরুর দিককার ঘটনা। দেখামাত্রই গুলির নির্দেশ বলবৎ হয়েছে। দলকা জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে আছি। আমার সঙ্গে খোকন, দীপক, খুদন কেশব, ফণী, কামাক্ষা এঁরা ছিলেন। দেড়দিন প্রায় কিছুই খাইনি। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ঘোলা জল খেয়েছি। কেশবের ঝোলায় একটু গুড় ছিল। সেই গুড় আমাদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তখন জঙ্গলের আড়ালে ঘুরে বেড়াতে, দিন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। রাতে জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসা মুশকিল ছিল। কারণ, পুলিশ সার্চলাইট ফেলে টহল দিত। চারুবাবুকে খবর পাঠিয়েছিলাম, এখানে থাকা নিরাপদ নয়। আমাদের সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। উনি নিজেই একটা জিপ নিয়ে এসেছিলেন।

"দেউমুনি-কেষ্টপুরের মাঝখানে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গাড়ির বনেট তুলে মাথা ভিতরে ঢুকিয়ে গাড়ি মেরামতের ভঙ্গি করে পুলিশকে এড়িয়ে ছিলেন। পুলিশের গাড়ি চলে যেতেই আমরা দৌড়ে গিয়ে জিপে উঠেছিলাম। বাগডোগরা হয়ে বিধাননগর পেরিয়ে সোনাপুরে ঢুকে যাই। সোনাপুরের ওভারব্রিজের কাছে নেমে যাই। সেখানে চারুবাবুর বন্ধু এবং তেভাগা আন্দোলনের কর্মী মুক্তি সিংয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠি। চারুবাবুরা শিলিগুড়ি ফিরে যান। রেললাইনের পাশে মুক্তি সিংয়ের বাড়িতে বিশাল একটা কড়াইয়ে সেদিন চাল এবং রসুন একসঙ্গে সেদ্ধ করতে দেওয়া হয়েছিল। সবাই মিলে গোগ্রাসে সেই এক কড়াই ভাত শেষ করে দিয়েছিলাম। অত খিদে জীবনে আর কখনও পায়নি।

"মুক্তি সিংয়ের বাড়ি থেকে আমরা গিয়েছিলাম দাসপাড়ায়। বাচ্চা মুন্সির বাড়ি। সেখান থেকে পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ) সীমান্ত খুব দূরে ছিল না। মাইল তিনেক হবে। হেঁটে গিয়ে নদী পেরলেই পাকিস্তান। এসময়ে খোকন (মজুমদার) আমাকে বলেন, আমরা তো পাকিস্তান হয়ে চীনে চলে যেতে পারি। সেখানে গিয়ে রাজনৈতিক এবং ফৌজি প্রশিক্ষণ নিতে পারি। আমি রাজি হয়ে যাই। বাচ্চা মুন্সির ভাই পাকিস্তানে রয়েছে আমার জানাই ছিল। বাচ্চা মুন্সি প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে রাজি হয়ে যান। ভোর ভোর আমরা পাকিস্তানে ঢুকে পৌঁছাই সেই বাড়িতে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই যেভাবে পুলিশ, গোয়েন্দাবাহিনীর লোকজন পাড়ার লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরম্ভ করল, তাতে বাচ্চা মুন্সির ভাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সেই আতঙ্কের চোখমুখ এখনও আমার মনে ভাসে। আমরা বিধাননগরে ফিরে আসি। কানাই বিশ্বাসের আনারস বাগানের ম্যানেজারের বাড়িতে উঠি। খোকন আর আমি ঠিক করি, নেপালের কাঠমান্ডুতে যাব। সেখানে চীনের দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলব। খুদন

মল্লিক আর দীপক বিশ্বাসের সঙ্গে এ নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়নি তখনও। তাছাড়া খোকন চাইছিলেন না, দীপক আমাদের সঙ্গে চীনে যাক। তখন আমি খোকনকে বলেছিলাম, একসঙ্গে আছি, পরে যখন জানতে পারবে, খারাপ হবে ব্যাপারটা। খোকন আমাকে এও বলেছিলেন, আমরা যে চীনে যাচ্ছি, তা চারুবাবুকেও জানানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি তা মানতে পারিনি বলে চারুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম আমাদের চীনে যাওয়ার ব্যাপারে তৎপরতার কথা।

"ট্রেনে করে বিহারের রক্সৌল হয়ে নেপালের বীরগঞ্জে গিয়ে কাঠমান্ডুর বাস ধরেছিলাম আমরা চারজন— আমি কৃষ্ণকুমার ওরফে কানু সান্যাল, খোকন মজুমদার ওরফে আব্দুল হামিদ, দীপক বিশ্বাস এবং খুদন মল্লিক। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাঠমান্ডুতে ছিলাম। এক মারোয়াড়ি ধর্মশালায় উঠেছিলাম। সেখানে খাটিয়া ভাড়া ছিল দু' টাকা করে। আমরা চারজন দুটো খাটিয়ায় ছিলাম। কাঠমান্ডু পৌঁছানোর পরদিন আমরা চীনের দূতাবাসে যাই। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়, তাতে সামান্য আশ্বাসও মেলে না। চাপাচাপি করায় রাষ্ট্রদূত বলেন পরের দিন আসুন। আমরা এরপর উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসে যাই। ওরা আমাদের কোনও পাত্তাই দেয় না। আমরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মারোয়াড়ি ধর্মশালায় ফিরে আসি। এদিন অবশ্য আমি চীনের রাষ্ট্রদূতকে বলে এসেছিলাম, যে করেই হোক, আমাদের চীনে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিদিন এরকম যাই, ঘুরে আসি। ভাবি, তাহলে কি আমাদের চীনের যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হল না?

"হঠাৎ ২২ সেপ্টেম্বর দূতাবাসে পৌঁছতেই আমাদের ব্যাপক খাতির যত্ন শুরু হয়। বিয়ার, অরেঞ্জ স্কোয়াসের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনার পর রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেন, ইউ আর ওয়েলকাম টু পিকিং। রাজনীতি এবং সফরের গোপনীয়তা নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা হয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। আমাদের এই সফর একেবারেই গোপন সফর, সেভাবেই শুরু হয়। রাতে দূতাবাসের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গাড়িতে আমাদের উঠিয়ে নেওয়া হয়। ল্যান্ডরোভার গাড়ি, দিনটা ছিল ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯। সকাল এগারোটায় আমাদের চারজনকেই গাড়ির পেছনের দিকের আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি চেকপোস্টে আমরা মাথা নিচু করে থাকি। পুলিশ দেখেও বোধ হয় দেখে না। সামনের আসনে বসা দুজন চীনা গাইড আর ড্রাইভারকে দেখেই আমাদের ছেড়ে দিচ্ছিল পুলিশ। সন্ধের মুখে আমাদের তিব্বত সীমান্ত ঘেঁষা নেপালের এমন একটা জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হয় যেখান থেকে মিনিট দশেক গেলেই নাকি তিব্বতে ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু সীমানায় যেহেতু নেপাল পুলিশের কড়া নজরদারি রয়েছে, তাই আমাদের জঙ্গল পাহাড় পেরিয়েই তিব্বতে ঢুকতে হবে। রাতে গাড়ি।

"চীনা দূতাবাসের দেওয়া দুজন গাইড আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ওঁরাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। কোগরি রোড ছেড়ে ততক্ষণে আমরা পাহাড়ি জঙ্গলের একটা গুহায় ঢুকে আড়াল নিয়েছি। আমাদের জানা হয়ে গেছে, রাতের অন্ধকারে তিনটি পাহাড় রাতারাতি পেরোতে হবে। একদিকে ডাকাবুকো কুকুরের উৎপাত, অন্যদিকে তিব্বত থেকে পালিয়ে আসা তিব্বতিদের লুটতরাজ। এই দুই বিপদ সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক করা হয়। রাত একটু ঘন হতেই আমরা জঙ্গল দিয়ে সংকীর্ণ পথে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠতে থাকি। এভাবে অনেকক্ষণ হাঁটার পর এক ঝুলন্ত সেতুর কাছে গিয়ে পৌঁছাই। কোশি নদীর ওপর সেই সেতুর কত নিচ দিয়ে জল বইছিল, তা অনুমান করা খুব মুশকিল ছিল। গাইডদের একজন কমরেড ওয়াং জানিয়েছিলেন, দিনের বেলা এই ঝুলন্ত সেতু পার হওয়া খুব কঠিন। কারণ, নিচের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরে যায়। প্রায় হাজার ফুট নিচে নদী। তক্তা লাগানো ব্রিজ। মাঝে মাঝে ফোকরও আছে। জীর্ণ শীর্ণ পুল। ওপরের মোটা রশি ধরে একরকম হামাগুড়ি দিয়েই ব্রিজটা পেরিয়েছিলাম।

"এরপর আরও ভয়ঙ্কর রাস্তা। পাহাড়ের ধার ঘেঁসে সরু রাস্তা, ডান দিকে খাদ। পাহাড়ের উঁচু দিকে ঝুঁকে হাঁটতে হবে, না হলে খাদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এর মধ্যে দীপকের জ্বর এসে গেছে। মনে হল মাঝপথে রাস্তা ভুল করে বসেছি আমি এবং দীপক। হঠাৎ কুকুরের আওয়াজ। কুকুর আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে খাদে পড়া থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। রাত তখন বারোটা-একটা হবে। কুকুর নিয়ে নেমে এসেছিল যারা, তারা খাম্বা উপজাতি গোষ্ঠীর দুই তিব্বতী। না, ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। কোথা থেকে ওরা নেমে এসেছিল, জানি না। ততক্ষণে আমরা ছ'জন এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছি, যেখানে বিছুটির ঝাড়। আর ওপরের দিকে ওঠা যাবে না। নামতে হবে এবার। কমরেড ওয়াং ম্যাপটায় টর্চ মেরে দেখে নিলেন। আমরা উত্তর দিক ধরে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। নদীর কাছে পৌঁছে দেখি, পাশেই ফৌজি ক্যাম্প। পরপর এগারোটি বন্দুক সাজানো। পাশে ঘুমিয়ে এগারো জওয়ান। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে পেরিয়ে গেলাম। আসলে নদী নয়, ঝর্নাই বোধহয়। মানে, রিভুলেট। সেখান থেকে আরও দুটো পাহাড় পেরোতে হবে। এমন পথ, যে পথে জোঁকেরও প্রচণ্ড উৎপাত। গাছের ওপরে থাকা জোঁকগুলো মানুষের গন্ধ পাওয়া মাত্রই ঝুপঝুপ করে ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়ছিল। অবিকল লাভা, লোলেগাঁও ক্যারেক্টারের জোঁক।

"দীপক হাঁটতে পারছেন না। ওঁর জ্বর বাড়ছে। কিন্তু উপায় নেই। দীপক আমাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। আরও দুটো পাহাড় কষ্ট করে পেরিয়ে যাওয়ার পর পাওয়া গেল কাঠমান্ডু-লাসার সেই রাস্তা, যে রাস্তায় আমরা কাঠমান্ডু থেকে গিয়েছিলাম। তখন ভোর হয়ে গেছে। ল্যান্ডরোভার জিপ দাঁড়িয়েছিল একটা। সেই জিপে করে পৌঁছে গেলাম পিপলস লিবারেশন আর্মির ক্যাম্পে। জোঁকে খাওয়া শরীর চাঙ্গা

করতে স্নান সেরে নিলাম সবাই। আমাদের পরতে হল পিএলএ-র ইউনিফর্ম। মুহূর্তে আমরাও মাও সে তুঙের ফৌজের সদস্য হয়ে গেলাম। চায়ের পর ফ্রায়েড রাইস, চিকেন এসব খাওয়া হল। পরদিন ভোরবেলা লাসা রওনা দিতে হবে। লাসার পথে মাঝখানে রিখাজায় এক বাড়িতে একরাত ছিলাম। সেখান থেকে পরদিন সন্ধেয় লাসায় ঢুকে পড়েছিলাম। পিএলএ ইউনিফর্মে। ইয়ালো ছামো ব্রিজ পেরিয়ে যখন লাসায় পিলএ ক্যাম্পে ঢুকছি, তখন দীপকের জ্বর উধাও। আমরা সবাই টগবগ করে ফুটছি সামরিক ছাউনিতে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান দেখে। লাসায় ঢোকার পর আমাদের বড় একটা চিনে মাটির গামলায় মাংসভর্তি ঝোল দেওয়া হয়। আমাদের এত খিদে লেগেছিল যে রুটি সবজির জন্য অপেক্ষা করতে পারিনি। ঝোলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে সব মাংস খেয়ে শেষ করে ফেলেছিলাম।

"পরের দিন পিকিং যাব। প্লেনে পাঁচ হাজার কিলোমিটার। মাও সে তুঙের দেশে যাওয়ার সেই আনন্দ হঠাৎই মিইয়ে গেল। ঘোষণা করা হল, আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ। সাতদিন উড়তে পারবে না প্লেন। দুর্যোগের আকাশ পরিষ্কার হতেই লাল ফৌজের তত্ত্বাবধানে

কানু সান্যালের সঙ্গে লেখক

আমাদের প্লেনে চাপানো হল। ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় উড়ল সেই বিমান। সেচুয়ান প্রদেশের রাজধানী ছেংডুতে নেমে জ্বালানি ভরে পিকিং পৌঁছল সন্ধের অনেকটা আগেই। ছেংডুতে আমরা কিছুক্ষণের জন্য নেমেওছিলাম। পিকিং বিমানবন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন চীনের বিদেশ দপ্তরের মধ্যমণি লিউ নিং ই। বিমানবন্দর থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় পাঁচতারা হোটেলে। সেখানে আমাদের সঙ্গী হন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুবাদে ভাল হিন্দি বলতে পারা কমরেড লিউ শি। হোটেলে প্রথমেই লাল ফৌজের সঙ্গে বৈঠক হয়। তিন মাস ছিলাম চীনে।

আগে একটা মজার ঘটনা বলে নিই। পিকিংয়ে পৌঁছানোর পর আমরা যখন বিমানবন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন কেউ একজন পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন, বিদেশি বন্ধুরা, থামবেন। পিছনে তাকিয়ে দেখি, খুদন নেই। খুদন মল্লিককে চীনেদের মতো দেখতে বলে আটকে দিয়েছে। কারণ অভিবাসন বিভাগের প্রশ্ন, ভারতীয় ডেলিগেশনের মধ্যে একজন চীনা কী করে ঢুকে গেছে?

"আমরা চীনে গিয়েছিলাম চীনের বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি দেখতে। সেখানকার সমাজব্যবস্থা দেখতে। সাধারণ শ্রমিক, কৃষক, গণ ফৌজ, গণ মিলিশিয়া, কমিউন, কারখানা দেখতে। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিখতে। উড়ে যাওয়া বিমানকে কী করে মাটিতে নামাতে হয়, কী করে গ্রেনেড ছুঁড়তে হয়, মর্টার চালাতে হয়, অবিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে বোমা বানাতে হয়, লাইট মেশিনগান কী করে চালাতে হয়, কার্বাইন চালানো, মাইন পোঁতা শিখতে। ওখানে তো সেসময় গণফৌজকেই কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে দেখেছি। পিকিংয়ে আমাদের রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন কমরেড ওয়াং। চীনে থাকার সময় অসমিয়া উচ্চারণে বাংলা বলতে অভ্যস্ত একজন মেয়ে কমরেড ইয়াং, আমাদের মধ্যে দোভাষী হিসেবে খুব সাহায্য করেছিলেন।

"চীনে থাকার সময় মাও সে তুঙের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ১ অক্টোবর। সেদিনটা চীন বিপ্লবের বিজয় দিবস। উৎসবের সেই দিনে মাও সে তুঙের জয়ধ্বনি করে নানা স্লোগান দিতে দিতে কাঁদছিল জনতা। আনন্দে। এরকম দৃশ্য তো আর কোথাও দেখিনি। সেদিন তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে সেই বিপুল জন সমাবেশকে সম্বোধন করেছিলেন কমরেড লিন পিয়াও। সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাও সে তুঙ পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হন। আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় দোভাষীর কাছ থেকে পরিচয় জেনে নেন। ভেবেছিলাম লিন পিয়াও-ও মাওয়ের মতই করমর্দন করবেন। পরে জানলাম, উনি কারও সঙ্গেই হ্যান্ডশেক করেন না। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই আমাদের ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, ১৯৫২ সালে আমি ভারতে গিয়েছিলাম। তখন ভারতের সঙ্গে আমাদের পঞ্চশীল চুক্তি হয়েছিল। আমি যখন ভারতে যাই তখন হিন্দি চিনি বাই বাই (ভাই ভাই) বলে স্লোগান দিয়েছিল। কথাটা আমাদের উদ্দেশে বলেই চৌ এন লাই 'বাই বাই' বলে নাচতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আমরা হেসে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, মাও সে তুঙের সঙ্গে করমর্দন হয়েছে, এই যথেষ্ট। ওইরকম বড় মাপের একজন ব্যস্ত নেতা আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য

'চীনে থাকার সময় মাও সে তুঙের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ১ অক্টোবর। সেদিনটা চীন বিপ্লবের বিজয় দিবস। উৎসবের সেই দিনে মাও সে তুঙের জয়ধ্বনি করে নানা স্লোগান দিতে দিতে কাঁদছিল জনতা। আনন্দে। সেদিন তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে সেই বিপুল জন সমাবেশকে সম্বোধন করেছিলেন কমরেড লিন পিয়াও। সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাও সে তুঙ পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হন। আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় দোভাষীর কাছ থেকে পরিচয় জেনে নেন।

সময় দেবেন কী করে?

"দু'দিন পর আমাদের চীনে থাকার তিন মাস পূর্ণ হবে। আমাদের দেশে ফেরার মানসিক প্রস্তুতি চলছে। ১৩ ডিসেম্বর রাত ৯টা নাগাদ কয়েকজন কমরেড আমাদের রুমে এসে বললেন, সুখবর আছে। আজই কমরেড মাও আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবেন। তৈরি হয়ে নাও, এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। হোটেল থেকে আমাদের হাউজ অফ দ্য নেশনস-এ নিয়ে যাওয়া হল। চীন ভবনে এক বিশাল হলঘরের ওপ্রান্তে মাও সে তুঙকে দেখতে পেয়েই আমরা 'মাও চুষি ওয়ান চুই' স্লোগান দিতে লাগলাম। কমরেড মাও সে তুঙ জিন্দাবাদ। কমরেড চৌ এন লাই জিন্দাবাদ বলে এগিয়ে গেলাম মাওয়ের দিকে। সেই ঘরে তাঁর আশপাশেই ছিলেন লাল ফৌজের প্রধান লু লিন ই, সাংস্কৃতিক বিপ্লব বিভাগের প্রধান কাং শেন। মাও আমাকে জড়িয়ে ধরলেন প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে। পরিচয় পর্ব চুকতে না চুকতেই চা এল। মাও আমাদের সিগারেট দিলেন। আলোচনা শুরু হল। মাও নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলেন। শুনে বললেন, উই সাপোর্ট ইউ ইন প্লুরাল। যদি তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পার, লেনিনীয় তত্ত্ব মেনে জনগণের মধ্যে থেকে এগিয়ে যেতে পার, বিপ্লব করতে পারবে। যখন হুনানে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম, তখন কিছু গাদা বন্দুক, শট গান-টট গান দিয়ে শুরু করেছিলাম। লড়ো, ব্যর্থ হলে আবার লড়ো, আবার ব্যর্থ হলে আবার লড়ো, যতক্ষণ না জয়লাভ করতে পার।

"আমি সেদিন মাও সে তুঙকে নকশালবাড়ি অঞ্চলের শ্রমিক-কৃষকদের অতীত ইতিহাস, শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস বলেছিলাম। জানিয়েছিলাম, ১৯৪৬ সালে সূচনা হলেও ১৯৪৮-৫১, সেই সংগ্রামে ভাটা পড়েছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির হঠকারী ও অতি বাম বিচ্যুতিতে। তারপর ১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত নকশালবাড়ির ইতিহাসে চলে এক দীর্ঘস্থায়ী লড়াই। এরকম বহু কথাই হয়েছিল ২২ মিনিটের বৈঠকে।"

কানু সান্যাল এদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, 'একটা কথা বলে রাখি, সেদিন মাও সে তুঙ যেভাবে গণভিত্তি তৈরি করে এগতে বলেছিলেন, সেই পথ ধরে যদি চারুবাবু দলটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দিতেন, তাহলে নকশালবাড়ির লাল অঞ্চল আশপাশের বহু লাল অঞ্চল তৈরি করতে পারত। মুশকিলটা হল কী জানেন, নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের সঙ্গে চারুবাবু কখনও জড়িত ছিলেন না। উনি তো হার্টের ব্যামোয় শিলিগুড়িতে শয্যাশায়ী ছিলেন। চারুবাবু যেভাবে চেয়েছিলেন, আমি সেভাবে চলতে চাইনি বলেই নকশালবাড়িতে সেদিন অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে, চারুবাবুর মতবাদের পরীক্ষা চলেছিল চটেরহাটে, সেখানে তার মতবাদ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছিল।' (চলবে)

এই নিবন্ধের তথ্য ও অভিমত প্রতিবেদকের একান্ত নিজস্ব, এর দায় পত্রিকার প্রকাশক বা সম্পাদকের নয়।

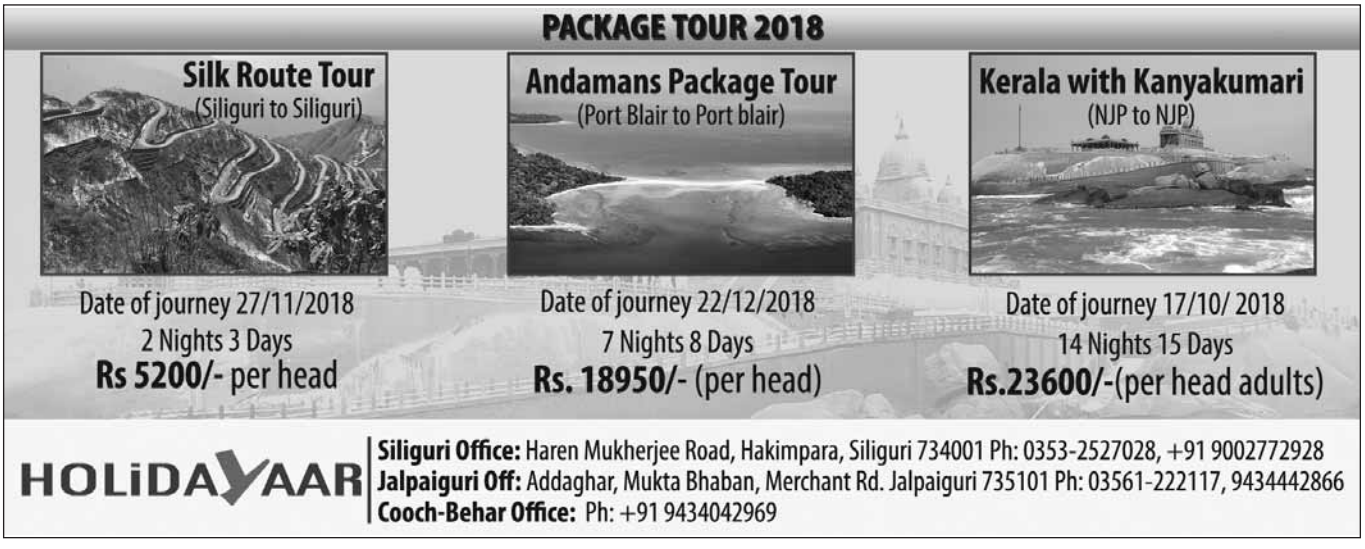

ছিট বিনিময়ের তিন বছর পূর্তিতে প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার এক রেখাচিত্র

সাবেক ছিটবাসীদের নানা অসন্তোষে ইন্ধন যোগাচ্ছে ভারতবিরোধী চক্র

দেখতে দেখতে তিন তিনটি বছর অতিক্রান্ত। ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই ছিটমহল হস্তান্তর পর্ব সম্পন্ন করেছিল ভারত ও বাংলাদেশ। আনুষ্ঠানিকভাবে অধরা একটি সীমান্ত সমস্যার সমাধান খোঁজবার চেষ্টা করেছিল উভয় দেশ। আপাতদৃষ্টিতে দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতা ব্যতিত অবশিষ্ট সকল ছিটমহল আজ ইতিহাস। ভারতের ১১১টি ছিটমহলের কমবেশি ১৭ হাজার একর ভূখণ্ডের সঙ্গে ৫১টি বাংলাদেশি ভূখণ্ডের কমবেশি ৭ হাজার একর ভূখণ্ডের বিনিময় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর ১১১টি সাবেক ভারতীয় ছিটমহল আজ বাংলাদেশি ভূখণ্ডে পর্যবসিত। পক্ষান্তরে ভারতের কোচবিহার জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত ৫১টি সাবেক বাংলাদেশি ছিটমহল আজ ভারতের মূল ভূখণ্ডে সামিল। ছিটমহল বিনিময় প্রক্রিয়ায় ভারতীয় ছিটমহলের প্রায় ৩৭ হাজার বাসিন্দার মধ্যে মাত্র ৯২২ জন বাসিন্দা মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এই নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে মোট ৯২২ জন তিনভাগে বিভক্ত হয়ে হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ ও দিনহাটায় অবস্থিত অস্থায়ী শিবিরে বসবাস করছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশি ছিটমহল হিসাবে পরিচিত ৫১টি ছোট-বড় ভূখণ্ডের ১৪ হাজারের অধিক বাসিন্দা বাংলাদেশ মূল ভূখণ্ডে গিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ভারতের মূল স্রোতে সামিল হয়েছেন। ভারতীয় প্রশাসন সাবেক বাংলাদেশি ছিট সমূহে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি।

ছিটমহল সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হলেও ছিটমহলবাসীদের সমস্যার স্বরূপটা কী? এর উত্তর খুঁজতে গেলে দুটি পর্বে আমাদের আলোচনা জরুরি। কারণ ছিটমহল বিনিময় উত্তর পর্বে আমাদের আলোচনার পরিধি মূলত ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থানরত সাবেক ছিটবাসীদের নিয়ে। এই ছিটবাসীরা দুটি পরিচয়ে পরিচিত। একটি ভারতীয় ছিটমহলবাসী এবং অপরটি বাংলাদেশি ছিটমহলবাসী। বর্তমানে সকলেই ভারতীয় নাগরিক, অর্থাৎ ভারতবাসী। ছিটমহল বিনিময়ের পর সাবেক বাংলাদেশি ছিটসমূহ যেমন মশালডাঙ্গা, পোয়াতুর কুঠি, বাত্রীগাছ, নলগ্রাম, ফলনাপুর, লোথামারি, ছিট শিবপ্রসাদ মুস্তাফি, ছিট কুচলিবাড়ি ইত্যাদি ছোট-বড় গ্রামে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৌর বিদ্যুৎচালিত সেচ ব্যবস্থা, কমিউনিটি হল ইত্যাদি নির্মাণ কার্যের পাশাপাশি সকল সাবেক বাংলাদেশি ছিটবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্থাৎ ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই সকল ছিটবাসীরা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে অর্থাৎ সাবেক বাংলদেশি ছিটমহলের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে প্রাপ্তির ভাঁড়ার এটুকু হলেও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজকর্মের গুণগত মান নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিটবাসীদের রয়েছে। যেমন রয়েছে ছিটমহল বিনিময়ের তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও জমির অধিকার না পাওয়ার বিষয়টি। এই বিষয়টি নিয়ে ছিটবাসীদের ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনা সাপেক্ষ। এই পর্বে যেটা সব থেকে উদ্বেগের তা হল— ছিটবাসীদের এই ক্ষোভকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির তৎপরতা, যা ভারতবিরোধী শক্তিকে উৎসাহিত করবার পক্ষে যথেষ্ট।

অন্যদিকে সাবেক ভারতীয় ছিটমহলবাসী যারা

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

প্রকৃত অর্থে ছিলেন কোচবিহার মহারাজার প্রজা তারা আজ তিনটি ভাগে বিভক্ত। একটি অংশ যারা উত্তরাধিকার সূত্রে ছিটমহলগুলিতে বসবাস করতেন তাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশ সাবেক পাকিস্তানি, পরবর্তীতে বাংলাদেশি মৌলবাদী শক্তি ও ভূমিদস্যুদের তাণ্ডবে বিভিন্ন সময়কালে ছিটমহলগুলি থেকে উৎখাত হয়ে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বাস্তুর ন্যায় জীবনযাপন করছেন। যদিও ছিটমহল বিনিময় পর্বে এঁরা রয়ে গেলেন উপেক্ষিত। প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবার ছিটমহল হস্তান্তর পর্বে কোচবিহারের জেলাশাসক তথা জেলা ভূমি সংস্কার আধিকারিককে তাদের জমির ক্ষতিপূরণ চেয়ে দরখাস্ত জমা দিয়েছিলেন। তারা আশা করেছিলেন সরকারি স্তরে জনশুনানির মধ্যে দিয়ে তাদের বক্তব্য সরকার জানতে চাইবে। কারণ তাদের

যারা উত্তরাধিকার সূত্রে ছিটমহলগুলিতে বসবাস করতেন তাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশ সাবেক পাকিস্তানি, পরবর্তীতে বাংলাদেশি মৌলবাদী শক্তি ও ভূমিদস্যুদের তাণ্ডবে বিভিন্ন সময়কালে ছিটমহলগুলি থেকে উৎখাত হয়ে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বাস্তুর ন্যায় জীবনযাপন করছেন। যদিও ছিটমহল বিনিময় পর্বে এঁরা রয়ে গেলেন উপেক্ষিত। ছিটমহল হস্তান্তরের তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও তারা অর্থাৎ প্রকৃত ছিটবাসীরা রয়ে গেলেন সেই তিমিরেই।

অনেকেরই হাতে রয়েছে কোচবিহার রাজ আমলের ভূমি সম্পর্কিত নথিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ। ছিটমহল হস্তান্তরের তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও তারা অর্থাৎ প্রকৃত ছিটবাসীরা রয়ে গেলেন সেই তিমিরেই। এক কথায় কে শোনে কার কথা? ছিটমহল বিনিময়ের এ এক অন্ধকার দিক।

সাবেক ভারতীয় ছিটবাসীদের উপরোক্ত পর্বটি যদি হয় মুদ্রার একটি পিঠ তবে মুদ্রার অপরটি হল বিনিময়যোগ্য ১১১টি ভারতীয় ছিটমহলে ৩৭ হাজারের অধিক মানুষের উপস্থিতি। পরিসংখ্যানটি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। বিপুল সংখ্যক ছিটবাসীদের বিতাড়িত করে ছিটগুলির দখল নিল কারা? ভারতীয় প্রশাসনের নির্লিপ্ততায় ও বাংলাদেশে হুশেন মহম্মদ এরশাদের শাসন আমলে রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম' ঘোষণার পর থেকে ছিটমহলগুলি মৌলবাদি শক্তির আখড়ায় পরিণত হয়। ছিটমহল বিনিময়ের আগে ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে যদি এনআরসি বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন করা হত তাহলে ছিটবাসীদের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ্যে আসত। যাই হোক সেটা আজ অতীত। ছিট বিনিময় পর্বে ভারতীয় ছিট থেকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে ২০১টি পরিবারের ৯২২ জন ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে তারা দিনহাটার সাহেবগঞ্জ, চ্যাংড়াবান্ধা ও হলদিবাড়ির ডাঙাপাড়া সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে যথাক্রমে দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি এনক্লেভ সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে অবস্থান করছে। হলদিবাড়ি ক্যাম্পে ৯৬টি পরিবারের ৪৭৯ জন, দিনহাটা ক্যাম্পে ৫৮টি পরিবারের ২৪৫ জন এবং মেখলিগঞ্জ ক্যাম্পে ৪৭টি পরিবারের ১৯৮ জন বসবাস শুরু করলেও মেখলিগঞ্জ ক্যাম্পে এক জনের মৃত্যুর পর বর্তমানে ২০০টি পরিবার এই মুহূর্তে তিনটি অস্থায়ী শিবিরে রয়েছে। এদের সকলেরই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক পরিবার বিনামূল্যে সরকারি গণবন্টন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে খাদ্যসামগ্রী পেয়ে চলেছে। ১০০ দিনের কাজ পাবার কথা থাকলেও তা প্রশ্নের উর্দ্ধে নয়। এই ক্যাম্পগুলিতে এমন কিছু পরিবার রয়েছে যাদের বেশ কিছু সদস্য পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। পরিবার বিচ্ছিন্ন সদস্যদের ভোটার কার্ডসহ নাগরিকত্ব প্রদান জরুরি। বেশ কিছু পরিবার রয়েছে যারা যৌথভাবে বসবাস করলেও তাদের পরিবারগুলির নতুনভাবে বিন্যাস হওয়া প্রয়োজন। দিনহাটা ক্যাম্পের প্রায় ৪০টির মতো পরিবার তাদের সাবেক ছিটমহল দাশিয়ারছড়ায় স্থাবর সম্পত্তি অবিক্রিত অবস্থায় ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সেই সকল ফেলে আসা স্থাবর সম্পত্তির মীমাংসা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। বার বার এই সকল পরিবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও তার সমাধান আজও হয়নি। দু' বছরের মধ্যে স্থায়ী আবাসনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা আপাতত অধরা। নির্মাণ কার্যের শম্বুক গতি এর মূলে। এছাড়াও স্থায়ী আবাসনের স্থান নির্বাচন প্রশ্নের উর্দ্ধে নয়। তিনটি ক্যাম্পে বসবাসরত পরিবারগুলির পরিবার প্রতি একজনের কর্মসংস্থান সরকার কি বিবেচনার মধ্যে আনতে পারে না? অনেকেই চায় সরকার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করুক। অন্যান্য বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে প্রথম দিকে প্রশাসন আন্তরিক থাকলেও কালের নিয়মে তা আজ গয়ংগচ্ছে পর্যবসিত। যদিও সংবেদনশীল এই সকল বিষয় সম্পর্কে সামান্য শিথিলতা কিংবা উদাসীনতা কাম্য নয়।

এমনিতেই ছিটমহল বিনিময় পর্ব থেকে ভারতবিরোধী একটি চক্র সক্রিয়। তারা যেনতেন প্রকারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভারতের ভাবমূর্তিকে কালিমাল্পিত করতে উদ্যোগী। ক্যাম্পগুলিতে বিভিন্ন অব্যবস্থার চিত্র সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে তারা সচেষ্ট। ক্যাম্পবাসীদের ক্ষোভকে পুঁজি করে তারা বলতে চায় যে ভারতে এসে তারা 'অসুখী'। বিভিন্ন ছোটখাট ঘটনায় সৃষ্ট অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে তারা ক্যাম্পবাসীদের ভারতবিরোধী করে তুলতে চেষ্টার কসুর করছে না। সাবেক বাংলাদেশি ছিটেও তারা অতিমাত্রায় সক্রিয়। এই সকল কার্যকলাপে বর্হিশক্তির হাত বা যোগসাজস থাকা অসম্ভব নয়। বিষয়গুলি সম্পর্কে জেলা প্রশাসনের সজাগ ও সতর্ক হওয়া জরুরি। সেই সঙ্গে ছিটমহল সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশাসনের সর্বস্তরে প্রয়োজন মানবিক মুখ এবং জেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা, যা এ ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শর্ত। মনে রাখা প্রয়োজন ছিটমহল ও ছিটবাসী সম্পর্কিত বিষয়টি সস্তা রাজনীতির বিষয় নয়। একে রাজনীতির উর্দ্ধে রাখাই সমীচিন। কারণ এটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। দেশের সম্মানের প্রশ্ন এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। পরিতাপের বিষয় হল এই 'বোধটির' আজ সবথেকে বড় অভাব।

সাফল্য ও জনপ্রিয়তা দুইই অব্যাহত রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে

দেখতে দেখতে তিন বছর পেরিয়ে চারে পা দিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে ২০১৫ সালের আগষ্ট মাসে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি হিসেবে উন্নীত হয়। এই ক'বছরেই যার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক মানের সেমিনারে দেশ বিদেশের নানা বিশিষ্টজনেরা আসছেন ছাত্রছাত্রীদের নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জনে। সম্প্রতি এম বি এ কোর্স চালু করেছে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোর্স চালু হয়েছে। অন্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক কম খরচে এই কোর্স করা যাবে এখানে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি আসাম, ত্রিপুরা প্রতিবেশি রাজ্য বিহার এমনকি বাংলাদেশ থেকেও ছাত্রছাত্রীরা এই প্রফেশনাল কোর্সে যোগ দিতে পারছে। এছাড়াও চলচ্চিত্র বিষয়েও পঠনপাঠনের উদ্যোগ গ্রহন করছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারে ছাত্রছাত্রীদের সিনেমা সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। সম্প্রতি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে সেমিনারে এসেছিলেন সাইমন ফেদারস্টোন। শুধু তাই নয়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শহরবাসীর আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে। বহু বছর থেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিবেশিত অনুষ্ঠান মন ছুঁয়ে যায় শহরবাসীর। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্র ছাত্রীরা আসে। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবছর থেকে ফের সান্ধ্য বিভাগে ক্লাস শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। স্টেট অ্যাসেম্বলি আইনে গড়ে ওঠায় এতদিন পর্যন্ত স্টেট ইউনিভার্সিটি হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিগণিত হয়ে আসছিল। রাজ্য সরকার থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অনুদান আসছিল। সম্প্রতি ইউ জি সি-র টুয়েলভ বি-র অনুমোদন পেতে আবেদন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

মাত্র তিন বছরের ফল বললে ভুল হবে, মহাবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, এই দীর্ঘ যাত্রাপথের সূচনার সালটা ছিল ১৯৪৭। তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরের ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে সুকুমার গুহ, নির্মলচন্দ্র ঘোষ ও এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষদের সহায়তায় রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয় গঠনের রূপরেখা তৈরি হয়। পরিচালন সমিতির সম্পাদক নির্মলচন্দ্র ঘোষ, অধ্যক্ষ কৃষ্ণকুমুদ সরস্বতী, অধ্যাপক গোপাল মজুমদার, চিত্তরঞ্জন মৈত্র, হিরন্ময় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ দাস, করণিক কুমার ঘোষদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলে শুরু হয় রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম ক্লাস। ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়। এরপরই শুরু হয় রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া। নির্মল কুমার ঘোষ ও যামিনী ঘোষ এই কলেজের ভবন নির্মাণের জন্য রায়গঞ্জ মৌজায় চ্যাংমুড়ি বিলের পাশে জমি দান করেন। ছাত্রছাত্রী -অধ্যাপকদের সংগৃহীত অর্থে শুরু হয় ভবন নির্মাণের কাজ। ১৯৫১ সালে রায়গঞ্জ করোনেশন বিদ্যালয় থেকে উঠে গিয়ে নিজস্ব ভবনে শুরু হয় রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের পঠন পাঠন। ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রথম বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয় এই ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। ১৯৫৫ সালে রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয় প্রথম স্নাতকস্তরে পঠনপাঠন শুরু করার অনুমোদন পায়। অধ্যক্ষ কৃষ্ণকুমুদ সরস্বতীর নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯৫৮ সালে এখানে স্নাতকস্তরে বিজ্ঞান বিভাগের পঠনপাঠন শুরু হয়। হরিচরণ দেবনাথ, সুশীল কুমার গুহ খাসনবিশ, চিত্তরঞ্জন আচার্য, জ্যোৎস্না কুমার সেন, নৃসিংহ প্রসাদ সিংহ, নলিনী ভট্টাচার্য, রাইচরণ মোদক, বীরেশচন্দ্র গুহ প্রমুখ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কৃষ্ণকুমুদ সরস্বতীর অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসরের পর ১৯৬০ সালে রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন শম্ভু নাথ রায়।

২০১৫ সালের আগষ্ট মাসে ইউজিসি-র অনুমোদনে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ ইউনিভার্সিটির স্বীকৃতি পায়। সঙ্গে উত্তরসূরিতায় পেল রায়গঞ্জ কলেজের বহু মূল্যবান গ্রন্থ, জার্নাল, সংরক্ষিত লাইব্রেরি, ছাত্র ছাত্রীদের গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরি, ভেষজ উদ্যান, ১০ কোটি বছর প্রাচীন উদ্ভিদ জীবাশ্ম আরও অনেক কিছু। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে নিরন্তর নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে নবগঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাবনীয় জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে যে এর সাফল্য শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে চলেছেন দিনাজপুরের মানুষ।

১৯৬২ সালে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর কয়েকবছরের মধ্যেই অধ্যক্ষ শম্ভু নাথ রায়ের উদ্যোগে বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, অঙ্ক, রসায়ন, অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স চালু হয়। ১৯৬৬ সালে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনুভা বসাক বাংলা স্নাতক পরীক্ষায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৫ সালে বশিষ্ট নারায়ণ ঝাঁ সংস্কৃত অনার্সে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন। রায়গঞ্জ কলেজের ধারাবাহিক সাফল্য ও পরিকাঠামো দেখে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এসি রায় এই কলেজকে ইউনিভার্সিটি কলেজ এর স্বীকৃতি দেন। এই বছরই চালু হয় দর্শন ও পদার্থ বিষয়ের অনার্স পাঠ্যক্রম। ১৯৬৭-৬৮ সালে নৈশকালীন ক্লাসে কমার্স বিভাগে স্নাতক পাঠ্যক্রমের সূচনা হয়। ১৯৬৯ সালে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স

পাঠ্যক্রম চালু হওয়ার পাশাপাশি প্রাণীবিদ্য -উদ্ভিদবিদ্যা পাসকোর্স চালু হয়। ১৯৮১ সালে চালু হয় প্রাণীবিদ্যা -উদ্ভিদবিদ্যার অনার্স পাঠ্যক্রম। এরপরও একাধিকবার এই জেলার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফলে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৯৫ সালে সেরিকালচার, ভূগোল, ২০০২ সালে বিসিএ কোর্স চালু হয়। এর কিছু বছর পরই প্রথম রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজে মাইক্রোবায়োলজি ও বাংলায় স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন শুরু হয়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা এতে উত্তর দিনাজপুর জেলাতে বসেই স্নাতকোত্তর হওয়ার সুযোগ পান।

২০১৩ সালে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ উত্তম রায় ও রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যাপক কাউন্সিলের সম্পাদক মিলন রায়ের উপস্থিতিতে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস নির্মানের পরিকল্পনা গৃহীত হয় জেলার ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে। এই বছরই রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যক্ষদের সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী, সেই সময়ে কলেজের পরিকাঠামো দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপকরা একে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। জমা দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। এই বছরই নভেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় এর কথা ঘোষণা করেন।

২০১৪ সালের ১১ ই নভেম্বর বিধানসভায় রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় বিল আকারে পাস হয়। ২০১৫ সালের ২১ জানুয়ারি এটি অ্যাক্ট আকারে প্রকাশ পায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের পদে আসীন হন রাজ্যপাল কে এন ত্রিপাঠি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ অনিল ভুঁইমালী উপাচার্য পদে নিয়োজিত হন। এই দুই জনের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মুখ্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের মুখ্য সচিব, রাজ্য উচ্চ শিক্ষা সংসদের সদস্য সচব, গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল" বিভাগের ডাঃ রথীন ব্যানার্জী, কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডাঃ দিলীপ রায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রীতা ঘোষ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ডাঃ তাপস মোহন্ত ও অঙ্ক বিভাগের ডাঃ অশোক দাস, রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পৃথ্বীরাজ ঝাঁ, বালুরঘাট কলেজের ডাঃ দেবজ্যোতি সরকার এবং বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির আদ্যপ্রসাদ পান্ডেকে প্রমুখদের নিয়ে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কাউন্সিল গঠিত হয়।

২০১৫ সালের আগষ্ট মাসে ইউজিসি-র অনুমোদনে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ ইউনিভার্সিটির স্বীকৃতি পায়। সঙ্গে উত্তরসূরিতায় পেল রায়গঞ্জ কলেজের বহু মূল্যবান গ্রন্থ, জার্নাল, সংরক্ষিত লাইব্রেরি, ছাত্র ছাত্রীদের গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরি, ভেষজ উদ্যান, ১০ কোটি বছর প্রাচীন উদ্ভিদ জীবাশ্ম আরও অনেক কিছু। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে নিরন্তর নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে নবগঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাবনীয় জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে যে এর সাফল্য শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে চলেছেন দিনাজপুরের মানুষ।

অপরাজিতা জোয়ারদার

হংকং

শিলিগুড়ি ডায়েরি

এক প্যাকেট চকোলেট! সুদৃশ্য মোড়ক। অষ্টমঙ্গলার দিন উপহার পেল বোনঝি। ছোট একটি পার্স! খুললে বেরিয়ে পড়ে সুদৃশ্য একটি আয়না আর অপূর্ব হাতলওয়ালা একটা চিরুণি। বৌদি দিদিদের জন্য উপহার। আরও মজা উন্মোচিত হল যখন নতুন জামাই বাবাজী চোখেমুখে অহংঅহং-হাসির লুকোচুরি খেলিয়ে বলে উঠল - "উঁহুহু ওভাবে নয়,সাদা মোড়ক সুদ্ধ খেতে হয়"। ও মা! তাও আবার হয় নাকি! বলছে বটে, মুখেও পুরছে মোড়ক সহ আর সবার ঝলমলে মুখ দেখতে দেখতে জামাই বাবাজীর সঙ্গে সদ্য কনকাঞ্জলি দেওয়া মেয়েটিরও বোঝা হয়ে গেল, ভিনিভিডিভিসি! আহা! এ যেন একটা গিলিগিলি প্রযোজনা, পি সি সরকারের ম্যাজিকের চাইতেও মোহময়। মূল্য? আয়না পার্স পনেরো টাকা আর চকোলেটের প্যাকেট পঁচিশ টাকা।

যাদুর ছড়িটি লুকিয়ে আছে হংকং মার্কেটের অলিগলিতে।

বিধান মার্কেট আর শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের মধ্যে স্যান্ডুইচ হয়ে আছে এই ম্যাজিক মার্কেট। ভেতরে ঢোকার মুখে সারি সারি জুতোর দোকান। তার দু'পাশে হাত দেড়েক তফাৎ-এ গায়ে-গা লাগিয়ে একেক টুকরো খোপ। যাদুকরের ঝুলি যেন! ঐ খোপের ভেতর এত জিনিস কীভাবে ধরে বলে আশ্চর্য হতে হতে মনে পড়ে যায় এনজেপি থেকে প্রথম প্রথম দার্জিলিং মেলের স্লিপার ক্লাসে ওঠার পরের দৃশ্যাবলী। কী অবলীলায় সেইসব লোকেরা ট্রেনের কামরার দেয়ালের পাটাতন খুলে ফটাফট সাজিয়ে ফেলতো জিনিসপত্র। অথবা বাথরুমে যেতে গিয়ে তাদের কৃৎ-কৌশল শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হত। এখনও প্রায়দিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে থমকে সরে যেতে হয়, রাস্তার কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কতিপয় বাইক ও স্কুটির উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে আতঙ্কিত হই। চালক ও বাহকের মাঝখানে পিলিওন-রাইডার হয়ে সাদা কাপড়ের বিশাল বিশাল প্যাকেট! সব ক'টা যানের গতিমুখ এনজেপি স্টেশন। কী আসে, কী যায় জানার আগ্রহ রয়ে যায়!

পড়তে আসে বেশ কিছু মেয়ে। প্রতি বছর নতুন কিছু মেয়ে আসে। তাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপচারিতায় একবার নতুন একটি কাজের কথা শুনতে পাই। 'ডালা আছে।' কী? 'দুটো ডালা।' বেশি কিছু জানতে চাওয়া বোকামি হতে পারে ভেবে চুপ করে যাই।

হংকং মার্কেটের মুখোমুখি টেবিল পেতে অনেকে নানা জিনিস নিয়ে বসেন, সেটাই ডালা। বড়ো রঙীন খুব আকর্ষক সেইসব জিনিস দেখতে দেখতে, কখনও আবার দরদাম করতে করতে ভুলে যাই এদের লড়াইয়ের ময়দানে টিকে থাকার চালচিত্র। এই শহরে ভ্রমণপ্রেমীদের ভিড় হয় বেজায়। আর সকলেই একবার এই 'তীর্থস্থান'টি না দেখে ফেরার গাড়িতে চাপেন না, তা সে বাস ট্রেন উড়োজাহাজ যাইই হোক না কেন! একটি সুন্দর রাধাকৃষ্ণের মন্দিরকে পাশে রেখে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে রাত সাড়ে নয়টা অব্দি চলে বিকিকিনি। গলির ভেতরে গলি তার ভেতরে শাখা-প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে এক যাদু-কি-ঝোলি। কী নেই! ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র থেকে শুরু করে জামাকাপড়,হোসিয়ারি দ্রব্যাদি, ঘর সাজানোর সরঞ্জাম, প্রসাধন সামগ্রী, জাঙ্ক জুয়েলারি, কম্বল, চকোলেট, কুকিস সব সব। শুধু কিনতে জানা চাই, রীতিমত দরদস্তুর করে।

শীতকালে পরার জন্য বেশ সুন্দর চটি পাওয়া যায়। একবার কলকাতায় আত্মীয় বাড়িতে গিয়ে বের করতেই ফটাফট বেশ কয়েকটি অর্ডার চলে এলে। যারা শপিং করতে ভালবাসে তাদের জন্য অসাধারণ জায়গা বটে। আগে চায়না থেকে আর অন্যান্য এশীয় দেশগুলি থেকে দারুণ দারুণ খেলনা আসত। এখনও আসে, তবে জল মিশে গিয়েছে দু'যুগ আগেই। ছাতা কেনার আদর্শ জায়গা ছিল বটে! রকমারি ছাতা! এখনও বাইরে থাকা পরিচিত অনেকে সেই ছাতার অর্ডার দিয়ে থাকে।

আশপাশে বহু খাবারের দোকান, কাছ ঘেঁসে হিলকার্ট রোডের ওপর বিলাসবহুল হোটেল সব থাকলেও জায়গাটি বড় সংকীর্ণ। তার মধ্যে ট্যুরিস্ট তরজা সব মিলে বিস্মৃতির আড়ালে ফেলে রাখে এককালের 'বেঙ্গল রাইস মিল'কে। একসময়ের হাস্কিং মেশিনের শব্দ আজ মুখ লুকিয়েছে গাড়ির শব্দ আর অজস্র মানুষের হাঁকডাকের নিনাদে। পাশেই ছিল ভাগাড়। আজ সেখানে বিধান মার্কেট। তারও একটা ইতিহাস আছে। সেকথাও আসবে পরবর্তী কোনও অধ্যায়ে। বিভিন্ন মেট্রো শহরে এখন এরকম মার্কেট আছে বৈকি, কিন্তু শিলিগুড়ি ও হংকং মার্কেট যেন অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে। এখনও বাড়িতে মেহমান এলে একটা দিন নির্দিষ্ট থাকে এই যাদু-কি-ঝোলির জন্য। গ্লোবালাইজেশন মুক্ত বাণিজ্য কিছুটা ছাপ ফেললেও এখন ও স্ব-মহিমায় বিরাজ করছে শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট।

হংকং মার্কেট নামের মধ্যেই তো বিদেশি গন্ধ। তবে চায়না থেকে প্রচুর জিনিস আসত বলেই এরকম নাম কি না তা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে জানা তো হয়ই নি বরং গুচ্ছ গুচ্ছ জিনিস ঢুকে পড়েছে ঘরে।

তবে অনেক খুঁজেছি, আজ আর পাওয়া যায় না সেই উইলসন পেন আর

পার্স-আয়না।

শ্যামলী সেনগুপ্ত

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ডুয়ার্সের রাগবি দধিকাদো

উত্তরবঙ্গের তথা ডুয়ার্সের অতি প্রাচীন একটি গ্রামীণ খেলা 'দধিকাদো'। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক গ্রামীণ সংস্কৃতির মতোই হারিয়ে যেতে বসেছে এই সুপ্রাচীন খেলাটি। দধিকাদো, যার পোশাকি নাম নারকেল খেলা, সেটি সাধারণত উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। বিশেষত কোচবিহার জেলার বিভিন্ন গ্রামে জন্মাষ্টমীর সময়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরের দিন অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের এই খেলায় মেতে উঠতে দেখা যেত। গ্রামের বিভিন্ন পরিবার এককভাবে, আবার কখনও যৌথভাবে এই খেলার আয়োজন করে। নিয়মটা হল, একটা ফাঁকা জায়গায় জল ঢেলে তাকে কর্দমাক্ত করা হয়। খেলার আগের দিন তুলসীতলায় নারকেল রেখে দেওয়া হয়। পরদিন ভোরবেলা গ্রামের সব বাচ্চা একত্র হয়ে আগে নারকেলটাকে পুজো করে যেখানে খেলা হবে, সেই কর্দমাক্ত জায়গায় রাখে। কাদা মাখা, পিচ্ছিল জায়গা থেকে ওই নারকেলকে নিজের দখলে রাখার লড়াই হল এই খেলার লক্ষ্য। শুধু যে বাচ্চা ছেলেমেয়েরাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করে তা নয়, অনেক সময় বড়রাও নারকেল দখলের লড়াইতে নেমে যায়। লৌকিক ধারণা, এই কাদা খুব পবিত্র। খেলার শেষে তাই গ্রামবাসীরা নিজেদের গায়ে-মাথায় এই কাদা মেখে নেয়। এর পর প্রসাদ খাবার পালা। দধিকাদো বা নারকেল খেলায় দর্শকরা যে নিছক আনন্দ উপভোগ করত বা শারীরিক কসরত দেখতে পেত তা কিন্তু নয়। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষকেই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত বলে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণও তৈরি হত। অথচ বিভিন্ন গ্রামে আজকাল এই খেলা আর প্রায় দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

(এখন ডুয়ার্স অগস্ট২০১৬ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

এখন ডুয়ার্স

আড্ডাঘর
ক্লাব আয়োজিত

মোবাইল ফোন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ২০১৮

আপনার মোবাইল হ্যান্ডসেটে তোলা সেরা পাঁচটি ছবি পাঠান

নাম ও ফোন নম্বর-সহ ৩১ অক্টোবর ২০১৮-এর মধ্যে।

বাছাই ছবির প্রদর্শনী **১৭-১৯ ডিসেম্বর, ২০১৮**

পুরস্কার বিতরণ ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৮

Whatsapp

9830410808

সৌজন্যে

SAGARIKA PLUS

MOBILE SHOP CHAIN

ডেমোক্রেটিক উপদেশ

অত মত প্রকাশ করার কী আছে? ত কেটে দ কর। মত হল মদ। কেনো আর খাও। দেশ স্বাধীন তো আপনার কী এমন পাখা গজিয়েছে স্যার? স্বাধীনতার মিনিং সংবিধানে লেখা আছে বলেই মানতে হবে এটা কোন দেশি স্বাধীনতা চাঁদু? আপনার বাড়ির মাল-মশলা আপনি আমার থেকে কিনবেন, এটা আমার স্বাধীনতা। না কিনলে রেপ কেস খাইয়ে দেব, সেটা আপনার পরাধীনতা। স্বাধীনতা থাকলে পরাধীনতা থাকবে। সায়েন্স বলে গেছে স্যার! পুরাণে পড়েন নি সিকিম্ন, জয় স্যি রাম এই সব মহামানবেরা কী বলে গেছেন!? যখন যখন অধর্মস্য এন্টিয়ার করবে তখন ধর্মস্য ঘন্টিয়ার বাজাবে। ঘন্টিয়ার বাজল মানে সিকিম্ন আবার আবির্ভাব করছেন। কী সাইন্টিফিক ব্যাপার বুঝেছেন তো? এর পর অত মত প্রকাশ করতে হবে না স্যার। বাড়ি গিয়ে টিভি দেখুন। হুইস্কি খান।

মত বলে কিছু যদি থাকে তো সেটা কয়েকজন প্রকাশ করতে পারে। বাল্মীকি রামকে নিয়ে লিখেছেন, বেদব্যাসার্ধ মুনি রাজাদের নিয়ে লিখেছেন— আরে মশাই, কবিরা শাসকদের নিয়ে লিখবে এটাই মত। তোরা শালা সরকারের পয়সায় খাবি আবার সরকারকে গালি মারবি? রাজ্যের মহা মহা কবি-রাইটার-এক্টররা ভোটের আগে জ্যোতি-বুদ্ধদের জেতান বলে কাগজের প্রথম পাতায় আবেদন রাখেন নি? এটাই হল মত। এখন দিদির ডাকে সাড়া দিলে আপনাদের অতি লাল হয়ে যাওয়াটা রিডিকুলাস লাগছে স্যার।

আসলে মত প্রকাশ করেই না ইন্ডিয়ার আজ এই দশা। গোড়াতেই বুলডোজার চালিয়ে ফ্ল্যাট করে দিত, দেশ শালা মধ্যযুগের মত চলত। আগে কত্ত সুবিদে ছিল ভাবুন তো স্যার! চার-পাঁচটা বিয়ে করলেন, কোনও মামলা নেই, ভয় নেই। বাইরে গিয়ে মাগীর পেছনে ঘুরলেন ফিরে এসে বউ-এর প্রণাম নিলেন। বউ-এর মত থাকলে পারতেন স্যার? তখন পয়সা থাকলেই মতের দাম থাকত। আজ একটা মেয়ের শরীরে

যদি মত চেপে রাখতে না পারেন, পেট যদি গুড়গুড় করে তবে রোমান্টিক হয়ে যান। মিষ্টি মিষ্টি মেয়ে আর দুষ্টু দুষ্টু ছেলের প্রেম লিখন। ফ্যামিলি কেচ্ছা নিয়ে পদ্য লিখুন। বিদেশের বিপ্লব নিয়ে নাটক নামান। প্রকৃতি দেখে মুচ্ছো গিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট মারুন। রোমান্টিক রসে ভিজে ক্যাৎক্যাতে হয়ে যান স্যার! না পারলে সেকুলারদের গালি মারুন। এতে হতাশা কমবে। খুব তো গেছিলেন পঞ্চায়েতে মত প্রকাশ করতে! পেটে চাকুর দাগটা কি এর মধ্যেই মিলিয়ে গেল স্যার? এরপর গণধোলাই হলে ভাল্লাগবে?

একটু টাচ মারুন ফেসবুক-মিডিয়া সব মিলে আপনাকে চেটে দেবে। সে যুগ হলে রেপ করে এসে দুটো লেঠেল নিয়ে পুজো দিতে বের হতেন, পাব্লিক সমস্ত মত সিন্দুকে ঢুকিয়ে ফেলত। আজ শালা মত প্রকাশ করে কী লাভ হয়েছে? তখন চাল ছিল টাকায় সাত মন এখন এক টাকা ভিখিরিও রিফিউজ করে!

অথচ দেশে একটা দারুণ ডেমোক্রেটিক ট্রাডিশন আছে স্যার। যাকে বলে হেরিটেজ। মতে না মিললে ঠ্যাঙিয়ে যমের বাড়ি পাঠাও। চল্লিশ জন মিলে একজনকে পিটিয়ে মারছে— উঃ! কী দারুণ গণতন্ত্র স্যার! মেজরিটি ভাবছে মাইনরিটি পেটাব। দিস ইজ আসল ডেমোক্রেসি! মেজরিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তুমি মত প্রকাশ করে কবিতা লিখছ— তুমি কি ভগবান? শালা তোমাদের জন্যই আজ হিন্দুদের এই অবস্থা! সীমান্তে জওয়ান

দেশের জন্য মরছে আর তুমি শালা মন্ত্রীর ভুল ধরছ! পাব্লিকের উচিত আর্মির মত হয়ে যাওয়া। রাস্তা দিয়ে মার্চ করে হাঁটবে। মন্ত্রী বলবে, তুমি বিরোধি! জেলে যাও! সোনামুখ করে জেলে চলে যাবেন। লাখো-কোটি পাব্লিক মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট মেরেছে, প্রধানমন্ত্রীকে ভোট মেরেছে— তা কি এমনি? তুমি কোন হরিদাস পাল স্যার যে এগেইনস্টে বলবেন? কেলিয়ে দাঁতের পাটি হাতে দিয়ে দোবো।

তবুও যদি মত চেপে রাখতে না পারেন, পেট যদি গুড়গুড় করে তবে রোমান্টিক হয়ে যান। মিষ্টি মিষ্টি মেয়ে আর দুষ্টু দুষ্টু ছেলের প্রেম লিখন। ফ্যামিলি কেচ্ছা নিয়ে পদ্য লিখুন। বিদেশের বিপ্লব নিয়ে নাটক নামান। প্রকৃতি দেখে মুচ্ছো গিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট মারুন। রোমান্টিক রসে ভিজে ক্যাৎক্যাতে হয়ে যান স্যার! না পারলে সেকুলারদের গালি মারুন। এতে হতাশা কমবে।

খুব তো গেছিলেন পঞ্চায়েতে মত প্রকাশ করতে! পেটে চাকুর দাগটা কি এর মধ্যেই মিলিয়ে গেল স্যার? এরপর গণধোলাই হলে ভাল্লাগবে? রামেও থাকুন, অনুপ্রেরণাতেও থাকুন। ত ছেড়ে দ লাগান। বেশি ডেমোক্রেসি মারিয়েন না।

শ পাঁচেক ছাড়ুন তো এবার!

অনু ঘটক

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

অভিনব ডুয়ার্সে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২০০ টাকা

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি।
দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের সেরা তিন লেখকের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

ক্রাইম থ্রিলার

লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা

ছোটদের বই

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। ১২৫ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা

সিকিম।
সংকলন। ২০০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে।
২য় খণ্ড ১৫০ টাকা

মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।
তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা

জয় জল্পেশ।
শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা

সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা

পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
মেইল করুন dooarsbooks@outlook.com **বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।**
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যাবে (বই না পেলে সরাসরি অর্ডার করুন আমাদের)

শিলিগুড়ি: হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড কাস্টমস বিল্ডিং সংলগ্ন। **ইকনমি বুক স্টল,** কলেজ রোড। **বিশ্বাস বুক এজেন্সি,** হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: আড্ডাঘর,** মার্চেন্ট রোড। **গ্রন্থ ভারতী,** ডিবিসি রোড। **আলিপুরদুয়ার: শ্যামলী বুক ডিপো,** নিউটাউন। **কোচবিহার: এস বি বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স,** রূপনারায়ণ রোড। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** গ্রন্থভারতী। ধানসিঁড়ি। ওয়েস্ট দিনাজপুর বুক সাপ্লাই এজেন্সি। **কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর,** কলেজ স্ট্রিট।

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন
উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

EKHON DUARS, Vol-5, Issue-6 WBBEN/2014/56733, Rs. 20 Only

ডুয়ার্স প্যাকেজ টুর

২ রাত ৩ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা
৩ রাত ৪ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সুনতালেখোলা-জল্পেশ
তিনবিঘা-কোচবিহার।
৪ রাত ৫ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা
জল্পেশ-তিনবিঘা-কোচবিহার-জলদাপাড়া-বক্সা।
নিউ জলপাইগুড়ি/নিউ মাল থেকে,
ইকনমি/ডিলাক্স প্যাকেজ
যোগাযোগ ৯৮৩০৪১০৮০৮/৯৯৩৮৩২১২৩

DHUPJHORA SOUTH PARK
Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Common Dine-in place for breakfast- lunch-evening snacks-dinner,
Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী
মূর্তির পাড়ে
আয়েশের
সঙ্গে মেশে
রোমাঞ্চ

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.